তাবলীগ জামাতের

সমালোচনা ও জবাব

মূল লিখক

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হাফেজ

মুহাম্মদ যাকারিয়্যা ছাহেব সাহারানপূরী (রহঃ)

অনুবাদঃ

মাওলানা সাঈদ আল-মিসবাহ

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা – ১২১১

অনুবাদকের অন্যান্য বই

সালামের ফযীলত
কিতাবুল হজ্জ
শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্দা
মুসলিম নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপদেশ
গোলামানে ইসলাম
বিপদ থেকে মুক্তি

অনুবাদকের আরয

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব গোষ্ঠীর হেদায়েতের লক্ষ্যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়েকটি দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরিত করেছেন। সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল মানবজাতিকে গোমরাহী থেকে হিদায়েতের পথে আহবান করা। দ্বিতীয়তঃ তাদেরকে আল্লাহ পাকের যাবতীয় হুকুম আহকাম শিক্ষা দেয়া। তৃতীয়তঃ তাদের বাতেনী যাবতীয় রোগ ব্যাধির ইসলাহ করে তাদেরকে পুতঃপবিত্ররূপে গড়ে তোলা। চতুর্থতঃ তাদের মাঝে বিদ্যমান যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা করা এবং শরীয়তের বিধান জারী করা। পঞ্চমতঃ প্রয়োজনে কাফেরদের মুকাবেলায় জেহাদে অবতীর্ণ হওয়া।

এককথায়, তিনি ছিলেন একাধারে দাঈ তথা মুবাল্লিগ, মুআল্লিম (দ্বীন শিক্ষা দানকারী) সমস্যার সমাধান বা ফতোয়া প্রদানকারী, মুসলিহ, সংস্কারক, কাযী বা বিচারপতি, রাষ্ট্রনায়ক ও সিপাহসালার মুজাহিদ। এগুলো সবই ছিল তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রতিটিই অপরিহার্য।

পরবর্তী পর্যায়ে এ দায়িত্বগুলো আঞ্জাম দিতে গিয়েই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন, তাবলীগ জামাত, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি। প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

তাবলীগ জামাত

মূলতঃ তাবলীগ জামাত নতুন কোন দল বা সংগঠনের নাম নয় বরং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর সাহাবা কেরাম (রাঃ) থেকে নিয়ে প্রত্যেক যুগেই কমবেশী সম্মিলিত ও বিচ্ছিন্নভাবে দাওয়াতের এ দায়িত্ব পালিত হয়ে আসছিল।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) ব্যাপক আকারে ও সংগঠিতরূপে সেটির পুনঃজাগরণের চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই যেমন কিছু কর্মধারা ও সূচী থাকে তিনিও তেমনি এই জামাতের জন্য কিছু কর্মধারা তৈরী করেছেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর এ আন্দোলন আশাতীত সার্থক ও সফল বলে বিবেচিত হয়েছে, যা সকলের সামনে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। এ

জামাতের কর্মধারার সাফল্য ও উপকারিতা জামাতের সঙ্গে বের না হয়ে উপলব্ধি করা মোটেই সম্ভব নয়।

মাদ্রাসা

শরীয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দেয়া তথা ইলমের প্রচার প্রসারে মেহনত মুজাহাদা করা অন্যতম নববী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যারা আঞ্জাম দেন তারা হলেন আহলে ইলম। আর এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোই হল মাদ্রাসা।

বলাবাহুল্য এ 'মাদ্রাসা'ও শরীয়তে নতুন কোন সংযোজন নয়; বরং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই চলে এসেছে এর ধারা।

মসজিদে নববীর চত্বরে (সুফ্ফায়) কতক সাহাবা কেরাম (রাঃ) ইলম আহরণের জন্য সার্বক্ষণিক ইলম চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন, যাঁদেরকে আসহাবে সুফ্ফা নামে স্মরণ করা হয়। সেটাই ছিল ইসলামী ইতিহাসের প্রথম মাদ্রাসা।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) ছিলেন এই মাদ্রাসার অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য ছাত্র, যার জীবনের সিংহ ভাগ কেটেছে ইলম আহরণে ও বিতরণে। আর এ মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

খানকাহ

বস্তুত উম্মতের ইসলাহ বা সংস্কার অর্থাৎ তাযকিয়া তথা বাতেনী রোগ ব্যাধির চিকিৎসার এটি অন্যতম নববী দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব যারা আঞ্জাম দেন তারাই হলেন হক্কানী পীর বা মাশায়েখ। শরীয়তের দৃষ্টিতে হক্কানী পীর মাশায়েখের গুরুত্ব সর্বাধিক।

তাবলীগ জামাতের শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরামসহ সর্বস্তরের ওলামা কেরামের কেউ এটির গুরুত্বকে হেয় বা ক্ষুণ্ন করেননি। এজন্যই তাবলীগী বয়ানগুলোতে হককানী পীরের অজীফা আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। কোন জামাতে বিভিন্ন পীরের মুরীদ থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ পীরের বাতানো পদ্ধতিতে যিকির করতে বলা হয়।

তাছাড়া তাবলীগের মুরব্বীদের মধ্যেও অনেকেই হক্কানী পীর ছিলেন

এবং মুরীদ করতেন। যেমন, স্বয়ং মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ) প্রমুখ। তবে পীর হক্কানী হতে হবে।

সুতরাং বুঝা গেল, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দাওয়াত তাবলীগ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি কোনটিরই গুরুত্ব কম নয়। আল্লাহ না করুন দাওয়াতের এ আন্দোলন যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে খুব অল্প সময়েই মাদ্রাসা ও খানকাহগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে। কেননা, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মাদ্রাসার তালেবুল ইলমদের উল্লেখযোগ্য অংশ এসেছে তাবলীগ জামাতের মেহনতের বদৌলতেই। কারণ এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, মানুষের মধ্যে দ্বীনী জযবা পয়দা হলেই দ্বীন শিক্ষার আগ্রহ জন্মাবে। অন্যথায় তারা ইলম ও আহলে ইলমের ধারে কাছেও ভীড়বে না।

অনুরূপভাবে মাদ্রাসাগুলোর অবর্তমানে দ্বীনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। কারণ সহীহ ইলম ব্যতীত দ্বীনের অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব নয়। তদুপরি তাবলীগ জামাতের সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বয়ং হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসারই সন্তান। আর এজন্যই হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) ও এ জামাতের অন্যান্য আকাবীর সর্বদা ওলামা কেরাম ও মাদারেসের অপরিহার্যতার কথা প্রকাশ করেছেন। যেমন, ৪ ও ৫ সমালোচনার জবাবে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)-এর সুযোগ্য সন্তান তিনি নিজেও একটি মাদ্রাসার পরিচালক ও শিক্ষক ছিলেন। অন্যদিকে তাবলীগ জামাতেরও মুরব্বী ছিলেন।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর আচরণ ও উচ্চারণ থেকে যে কয়টি বিষয় বুঝে আসে তা হলঃ

[এক] মাদ্রাসা ও ওলামা কেরামের অপরিহার্যতার অনুভূতি তার মাঝে ছিল পূর্ণ মাত্রায়। তারপরও এ উক্তি কিভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, তাবলীগ জামাত কিংবা জামাতের মুরব্বীগণ মাদ্রাসা বিদ্বেষী। নিতান্ত কারো মুখে এ ধরনের কোন উক্তি বের হয়ে থাকলে সেটা নিছক তার ব্যক্তিগত অসতর্কতা ও অজ্ঞতা।

অনুরূপভাবে এ কথা বলাও সমীচীন নয় যে, আহলে মাদারেস তাবলীগ জামাত দেখতে পারে না। যদি তাই হয় তাহলে কি বলব যে, হযরত শায়খুল হাদীছ, হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এরাও তাবলীগ দেখতে পারেন না।

কেননা, তারাও তো মাদ্রাসার সাথে শুধু জড়িতই নন বরং মাদ্রাসার শিক্ষকও ছিলেন। অপরপক্ষে মাদ্রাসার অসংখ্য ওলামা কেরাম তাবলীগে অংশগ্রহণ করছেন কেন।

[দুই] তাবলীগ জামাতের সাথে মাদ্রাসার এবং মাদ্রাসার সাথে তাবলীগ জামাতের সম্পর্ক একই পাখীর দু'টি ডানার মত। একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোৎভাবে জড়িত।

[তিন] তিনি আহলে ইলম ও আহলে যিকির বলতে আহলে মাদারেস ও আহলে খানকাহকেই বুঝিয়েছেন।

সমালোচনা

এ কথা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে, নবী-রাসূল ছাড়া কেউ নিষ্পাপ নয়। কোন দল বা সংগঠন যতই উন্নত কর্মসূচীর ধারক বা বাহক হোক; তারা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সুতরাং তাবলীগ জামাতের সাথীদেরও যে কোন ভুলত্রুটি নেই এমনটি মোটেই নয়। এমনটি তবলীগ জামাতের মুরব্বীদের কেউ দাবী করেননি। বিশেষতঃ যখন এ জামাতের অধিকাংশই নতুন নতুন সাথী এবং গ্রাম্য অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। সুতরাং তাদের দ্বারা তো ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর এও সত্য যে, এ ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করার জন্য মারকাজ থেকে সর্বদা জীবনপণ চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপরও কিছুটা ভুলত্রুটি অবশ্যই থেকে যায়। সেটার সংশোধন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু সেটাকে কেন্দ্র করে গোটা জামাতকে অভিযুক্ত করা এবং বিরূপ সমালোচনার ক্ষেত্র বানিয়ে নেয়া মোটেই সমীচীন নয়।

তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে যারা সমালোচনা করে থাকেন তারা কয়েক ধরনেরঃ

[এক] নিছক জেদের বশবর্তী হয়ে।

[দুই] কোন মুবাল্লিগ ভাইয়ের সাথে ব্যক্তিগত কোন কোন্দলের ভিত্তিতে।

[তিন] নিছক শোনা কথার ভিত্তিতে।

[চার] আকাবীর ও বর্তমান ওলামা কেরাম অনেকে ইসলাহের উদ্দেশ্যে সত্যিকার ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়েছেন এবং দিয়ে যাচ্ছেন। যেমন, শায়খুল হাদীছ

সাহেব নিজেও অনেকের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অনেকে সেগুলোকে মূলধন ধরে সমালোচনা জুড়ে দেন।

অথচ সমালোচনার এ একটি পদ্ধতিও যুক্তি সঙ্গত নয়। তাই সকল সমালোচকদের খেদমতে আরয এই যে,

প্রথমতঃ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নিছক বিতর্কের মনোভাব না নিয়ে হযরত শায়খুল হাদীছের এই বইখানা পড়ুন।

দ্বিতীয়তঃ কিছু সময়ের জন্য এ জামাতের সাথে উঠাবসা করে নিজেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চেষ্টা করুন।

তৃতীয়তঃ সমালোচনার দৃষ্টিতে নয়; বরং ইখলাসের সাথে কোন ভুলত্রুটি সংশোধন করার ইচ্ছা থাকলে মারকাযের মুরব্বীদের সাথে যোগাযোগ করুন। বই-এ প্রকাশ করার মত কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে লিখুন।

জামাতের সাথী ভাইদের প্রতিও আরয এই যে, মারকায থেকে যেসব বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয় এবং জামাত রওনা হওয়ার সময় যে সব হেদায়েত দিয়ে দেয়া হয় সেগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনুন। নিজের মধ্যে আনতে চেষ্টা করুন। সাথীদের মধ্যে মুযাকারা করুন। মারকাযের মধ্যে বোর্ডে যেসব সতর্কবাণী টানিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন; তাহলে আর কারো কোন সমালোচনার সুযোগ থাকবে না।

কেউ কোন সমালোচনা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করলে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে তাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মারকাযের বয়ানে এনে বসিয়ে দেয়ার এবং তাশকীল করার চেষ্টা করুন।

আর এ কথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, আমার কোন আচরণ উচ্চারণের কারণে যেন গোটা জামাত সমালোচনার পাত্র না হয়।

আল্লাহ পাক সকলকে আমল করার তৌফীক দান করুন। এ অনুবাদ কার্যে যাদের কাছে আমি ঋণী আল্লাহ পাক তাদের যথাযোগ্য জাযায়ে খায়ের দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমালোচনা-১ / জেহাদ সংক্রান্ত হাদীছগুলো তাবলীগ	২
জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা	১২
সমালোচনা-২ / তালীগী জামাতের প্রচলিত পদ্ধতি	১৭
সমালোচনা-৩ / মাদ্রাসা ও খানকার প্রয়োজনীয়তার অস্বীকার	২৪
সমালোচনা-৪ / মাদ্রাসার বিরোধিতা	২৭
সমালোচনা-৫ / তাবলীগ জামাতের লোকেরা ওলামা বিদ্বেষী	২৯
হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর কয়েকটি বাণী	৩৯
সমালোচনা-৬ / তাবলীগ জাহেলদের কাজ নয়	৪৪
সমালোচনা-৭ / মাদ্রাসা ও খানকার বিরোধিতা	৪৭
সমালোচনা-৮ / আলেমদের বর্তমানে জাহেলদের আমীর নিযুক্তকরণ	৫২
সমালোচনা-৯ / হযরত থানুভী ও হযরত শায়খুল ইসলাম (রহঃ)-এর অপছন্দ	৬২
সমালোচনা-১০ / হযরত মাদানী (রহঃ) ও তাবলীগ জামাত	৭২
তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আকাবিরদের মন্তব্য ও বাণী	১০২
সমালোচনা-১১	১১১
সমালোচনা-১২	১১৪
সমালোচনা-১৩	১১৭
সমালোচনা-১৪	১২৪
সমালোচনা-১৫	১২৫
সমালোচনা-১৬	১৩২
জরুরী হেদায়েত	১৫৯
সমালোচনা-১৭	১৬৩
সমালোচনা-১৮	১৬৮
হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর কয়েকটি বাণী	১৭৬
পরিশিষ্ট	

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربنا و رب الحق - و الصلوة على رسوله الذى خلق له الحق و على اله و اصحابه الذى هم خير الحق

দাওয়াত ও তাবলীগের নামে হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)-এর এ সুবিশাল আন্দোলনের গোড়া থেকেই এ অধমের কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন, অভিযোগ-অনুযোগ আসা আরম্ভ হয়। আর তখন শরীরও যেহেতু সুস্থ ছিল তাই প্রতিটি পত্রেরই জবাব কম বেশী দিয়ে এসেছি।

আমার ধারণায় এ বিষয়ে অন্তত এক হাজার চিঠি লিখেছি। এর মধ্যে দু' একটি ছাড়া প্রায় সবগুলো একই ধরনের চিঠি ছিল। কিন্তু অধুনা কয়েক বছর যাবৎ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে প্রতিটি চিঠির ভিন্ন ভিন্ন জবাব লেখানো আমার পক্ষে আয়াস সাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই ইচ্ছা হল কতগুলো বহুল প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব পুস্তিকাকারে পাঠকের হাতে তুলে দেব।

তাছাড়া আরেকটি আশংকাবোধ করছি যে, হযরত থানুভী (রহঃ), হযরত হুসাঈন আহমদ মাদানী (রহঃ) প্রমুখ পূর্বসুরীদের অনেকেই বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে নিজেরাই সমালোচনার শিকার হয়েছেন যে, এরা তাবলীগ বিরোধী। সুতরাং আমার ব্যাপারেও এ ধরনের আশংকা হচ্ছে। কেননা, আমি নিজেও তাবলীগ জামাত ও তাবলীগ জামাতের মুরব্বীদের ভুলত্রুটির সংশোধন করে থাকি। বরং আমার বোকামীই বলুন কিংবা সৎসাহসই বলুন, শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর যুগে তাঁর ব্যাপারেও কোন প্রকার সমালোচনা করতে সংকোচবোধ করতাম না এবং তারপর স্নেহাস্পদ হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) ও হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রহঃ) সহ অন্যান্য নতুন-পুরাতন মুরব্বীদের ব্যাপারেও ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। অনুরূপভাবে মক্কা, মদীনা, পাকিস্তান ও আফ্রিকার বন্ধু-বান্ধব এক

কথায় কাউকেই ছাড়িনি। সুতরাং আমার বহু চিঠিতেই সমালোচনা ও অভিযোগ অনুযোগমূলক উক্তি মিলবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে অর্থহীন ও অনির্দিষ্ট কোন সমালোচনার প্রতি আমি কখনও কর্ণপাত করিনি। কেননা, এগুলো নিছক কথামাত্র। যেমন, দিল্লীর ওলামা কেরামের ব্যাপারে অনেকের অভিযোগ, তাঁরা সমালোচকদের সমালোচনাকে বাতাসের মত উড়িয়ে দেন; কোনই গুরুত্ব দেন না। এ ব্যাপারে আমি তো তাদের চেয়েও বেশী অগুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ হলে, তা যে কোন বড় ব্যক্তি সম্পর্কেই হোক না কেন, আমি তার প্রতিবাদ করতে এবং সতর্ক করতে কোন প্রকার ত্রুটি করিনি।

বুখারী শরীফে রয়েছে– হযরত উসামা (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, কতই না ভাল হত যদি আপনি হযরত উছমান (রাঃ)-এর সাথে এ ফিৎনাগুলো সম্পর্কে যা তাঁর আমলে দেখা দিচ্ছে আলোচনা করতেন। জবাবে হযরত উসামা (রাঃ) বললেন, তুমি কি বল, তাঁর সাথে আমার সব আলোচনা তোমার কাছেও বলে বেড়াই। নিভৃতে আমার সাথে তাঁর অনেক কথাই হয়ে থাকে। তবে আমি ফিৎনার বন্ধ দরজা খুলে দিতে চাই না।

যাহোক, আমারও আশংকা ছিল যে, আমার কোন সমালোচনা কিংবা সংশোধনমূলক কোন পত্রকে কেন্দ্র করে তাবলীগ বিরোধীরা এই অপপ্রচার না করে বসে যে, মাওলানা জাকারিয়া সাহেবও তাবলীগ পছন্দ করতেন না, যা মোটেই ঠিক নয়। কেননা, এ মুবারক আন্দোলনকে আমি এ যুগের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বের অধিকারী মনে করি। আমি নিজে মাদ্রাসা ও খানকার সাথে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করি যে, এ গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনটি কোন কোন ক্ষেত্রে মাদ্রাসা ও খানকা থেকে অধিক ফলপ্রসূ ও উত্তম।

যাহোক, তাবলীগ জামাত সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিম্নরূপঃ

সমালোচনা– ১

জেহাদ সংক্রান্ত হাদীছগুলো তাবলীগ জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা।

তাবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে সবচে' বড় অভিযোগ এই যে, এরা জেহাদ

সংক্রান্ত সকল হাদীছগুলো টেনে এনে তাবলীগের সফরের সাথে জুড়ে দেন। আরও মজার কাণ্ড এই যে, এ প্রশ্ন আহলে ইলমদের পক্ষ থেকেই বেশী এসেছে। বুঝেই আসে না যে, আহলে ইলম এ ধরনের প্রশ্ন কিভাবে করেন। কেননা, যদিও জেহাদ বলতে যুদ্ধ বিগ্রহই অধিক প্রচলিত, কিন্তু আভিধানিক অর্থে এবং কুরআন হাদীছের ব্যবহারে জেহাদ শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং মূলতঃ জেহাদ অর্থ আল্লাহর দ্বীন জিন্দা করার লক্ষ্যে চেষ্টা সাধনা করা। আর এ চেষ্টার সর্বশেষ ও অনন্যোপায় পথ হল যুদ্ধ-বিগ্রহ। যুদ্ধ-বিগ্রহই জেহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তফসীরে মাজহারীতে–

كتب عليكم القتال و هو كره لكم

এর ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ জেহাদ সকল আমল অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কারণ হল, তা ইসলাম প্রচার ও মানব গোষ্ঠীর হেদায়েতের একটি কারণ। সুতরাং মুজাহিদের প্রচেষ্টায় যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে এ মুজাহিদও তাদের যাবতীয় নেক আমলের অংশীদার হবে।

এও মনে রাখতে হবে যে, যাহেরী ও বাতেনী ইলম শিক্ষাদানের ফযীলত এরচেও বেশী। কেননা, এর দ্বারাই ইসলামের প্রচার প্রসার বেশী হয়ে থাকে। এবার একটু বুকে হাত রেখে বলুন তো; সম্প্রতি তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে হেদায়েতের যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করছে তা অস্বীকার করার কোন জো আছে কি? এঁদের মেহনতের উসীলাতেই কি হাজার হাজার বরং লাখো লাখো বে-নামাযী পাক্কা নামাযী বনে যাচ্ছেন না? এঁদের প্রচেষ্টাতেই তো আজ শত শত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে (গীর্জাগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে মসজিদ বানানো হচ্ছে।)

জেহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিস্তারিত বিশ্লেষণ এ অধমের গ্রন্থ 'আওযাজুল মাসালেক' ও 'লা-মেউদ্‌দারারির' টীকায় আলোচিত হয়েছে। জেহাদের আভিধানিক অর্থ হল, কষ্ট সহ্য করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় জেহাদ বলতে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহসহ নফস, শয়তান ও ফাসেক, ফাজেরদের সাথে মুজাহাদা করা সবগুলোকেই বুঝায়। আর কাফিরদের সাথে জেহাদ হাতের সাহায্যে, মুখের সাহায্যে ও অর্থের বিনিময়ে বিভিন্নভাবে হতে পারে। এ সবগুলো অর্থেই কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন জায়গায় জেহাদ শব্দটি

ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

المجاهد من جاهد نفسه

"প্রকৃত মুজাহিদ যে নফসের সাথে জেহাদ করে।"

[হাদীছখানা ইমাম বায়হাকী রচিত শি'আবুল ঈমান গ্রন্থের বরাতে মিশকাত শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।]

ইবনে আরাবী তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ সুফিয়া কেরামের মতে নফসের সাথে জেহাদই হল, জেহাদে আকবর তথা বড় জেহাদ। আর পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে و الذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে– শত্রুর মুকাবেলায় যে জেহাদ করে সে প্রকৃত মুজাহিদ নয়; বরং প্রকৃত মুজাহিদ হল যে, ঐ দুশমনের সাথে জেহাদ করে যে দুশমন সর্বদা তার সাথে রয়েছে।

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ইরশাদ করলেন,

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।[১]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এখানে জেহাদে আকবর বলতে তরবারীর যুদ্ধ এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয়।

তাতে এও রয়েছে যে, আল্লামা রাযী (রহঃ) লিখেছেন, 'সাবিলুল্লাহ (আল্লাহর পথ) বলতে সকল নেক আমলকেই বোঝায়।

হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ) 'আত্তাশাররুফ বি মা'রিফাতি আহাদীছিত্ তাসাউউফ' গ্রন্থে তাফসীরে রুহুল মাআনী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি

১। এ হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য 'লা-মিউদ্দারারি'-এর টীকায় দেখা যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনের আয়াত–

و جاهدوا فى الله حق جهاده ،

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত জাবের (রাঃ)-এর একটি রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে, একবার নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি জামাত যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের আগমন অত্যন্ত শুভ। তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে প্রত্যাবর্তন করলে। এসব রিওয়ায়েতগুলোতে সনদগত কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও প্রথমতঃ ফাযায়েলের ক্ষেত্রে তা ক্ষমার যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ বহুল সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এই দুর্বলতা ক্ষমার যোগ্য।

ওলামা কেরাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, নামায-রোযা প্রভৃতি ফরয ইবাদতগুলো মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে জেহাদ অপেক্ষা উত্তম। কেননা, ঈমান ও নেক আমল প্রতিষ্ঠাই জেহাদের মূল উদ্দেশ্য।

'লা-মিউদ্দারারি'র টীকায় আল্লামা ইবনে আবেদীনের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নিয়মিত যথাসময়ে ফারায়েযের আদায় জেহাদ অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এগুলো ফরযে আইন; আর জেহাদ ফরযে কেফায়া। তাছাড়া ঈমান ও নামায প্রতিষ্ঠার জন্যই জেহাদ জায়েয করা হয়েছে (অন্যথায় নিছক মারামারি, কাটাকাটি বৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই)। সুতরাং বুঝা গেল জেহাদ সত্ত্বাগতভাবে নয়; বরং কারণবশতঃ উত্তম। অপরপক্ষে নামায-রোযা ইত্যাদি স্বত্ত্বাগতভাবেই নেক আমল ও উত্তম। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নামায প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোন প্রচেষ্টাই করা হবে তা উত্তম জেহাদ বলে পরিগণিত হবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) জুমআর নামাযের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আবু আবাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে–

من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرم الله على النار

আল্লাহর পথে যার পা দু'টি ধূলিধূসরিত হবে, আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দিবেন।

একটু ইনসাফের সাথে বলুন তো; ইমাম বুখারী (রহঃ) যদি এই হাদীছখানা জুমআর নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে টেনে আনতে পারেন তাহলে তাবলীগী ভাইদের আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ঘুরাফিরার ফযীলত প্রসঙ্গে এ হাদীছ পেশ করাতে অপরাধটা কোথায়?

হযরত দেহলুভী (রঃ) (অর্থাৎ, মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইরশাদ করেন, তাবলীগী সফরে যুদ্ধ বিগ্রহের সফরের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ সফরেও যুদ্ধ সফরের মতই পূর্ণ ছওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। এ সফরে যুদ্ধ না থাকলেও জেহাদের একটি অংশ অবশ্যই রয়েছে, যা কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ অপেক্ষা কম হলেও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ অপেক্ষা উর্ধ্বে। যেমন, যুদ্ধের সময় রাগ দমন করতে হয়, এখানেও একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাগ-ক্রোধ দমন করতে হয় এবং তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাদের খোশামোদ, তোষামোদ করতে হয়। এরচে' অপদস্থতা আর কি হতে পারে?

"জেহাদে গোস্‌সা (ক্রোধ) দমন করতে হয়" হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর এ বক্তব্যটি বুখারী শরীফে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক রিওয়ায়েত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি এসে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, অনেকে গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। আর অনেকে বল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লড়াই করে (এদের কার যুদ্ধ আল্লাহর জন্য বলে গণ্য হবে?)। নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে জিহাদ একমাত্র আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে হয়ে থাকে সেটাই প্রকৃত 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'।

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, "আল্লাহর কালিমা" অর্থ ইসলামের দিকে আহবান।[১]

১। হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) আরও বলেন, আলোচ্য হাদীছে যেসব কারণে মানুষ জিহাদ করে থাকে বলে বলা হয়েছে তার মধ্যে 'রিয়া' (লোকদেখানো) ও প্রসিদ্ধি অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় (সাম্প্রদায়িকতার জন্য)ও এসেছে। আর এক রিওয়ায়েতে يقاتل غضبا (রাগের বশতর্তী হয়ে) এভাবে সবগুলো রিওয়ায়েতকে একত্রিত করলে মোট পাঁচটি উদ্দেশ্য হয়।

স্বয়ং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক এমন বিভিন্ন আমলকে জেহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা আলিম সম্প্রদায়ের অজানা নেই। যেমন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ইসলামী সীমান্তে রাত্রি জাগরণ দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তদপেক্ষা উত্তম। আর বলা বাহুল্য যে, সীমান্তে অবস্থান ইসলামের হেফাযতের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন গাযী (ইসলামী যুদ্ধে গমনকারী)-কে তার প্রয়োজনীয় সামান যুগিয়ে সহযোগিতা করবে, সেও গাযী বলে গণ্য হবে। আর যে তার অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নিবে, সেও গাযী বলে গণ্য হবে।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাবাহিনী প্রেরণকালে তাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের প্রত্যেক দু'জনের একজন যুদ্ধে বের হবে (অপরজন তার পরিবার পরিজনের খোঁজ-খবর নিবে) এতে উভয়ে সমান ছওয়াবের অধিকারী হবে।

বলাবাহুল্য, এসব সেনাবাহিনী নিছক মারামারি কাটা-কাটির জন্য প্রেরণ করা হত না। ঈমানের দাওয়াতই মুখ্য উদ্দেশ্য হত। যেমন বুখারী শরীফে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আলী (রাঃ)-কে ঝাণ্ডা হাতে দিয়ে খায়বর বিজয়ের জন্য প্রেরণ করলেন, হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, হুজুর! যেয়েই কি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিব, যাতে তারা মুসলমান হয়ে যায়? ইরশাদ করলেন, কস্মিন কালেও নয়; বরং সেখানে গিয়ে অত্যন্ত শান্তভাবে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তোমার প্রচেষ্টায় একজন লোকও যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে তা তোমার জন্য (গনীমতের) অনেকগুলো লাল উট অপেক্ষাও উত্তম। আর যদি তারা অস্বীকার করে, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে 'কর' আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ কর। এতেও যদি তারা সম্মত না হয়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর।

এ ছাড়াও বিভিন্ন রিওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত জেহাদেও নিছক যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয়; বরং এতেও ঈমানের প্রতি আহবান ও আল্লাহর কালিমা

বুলন্দ করা উদ্দেশ্য।

মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) নাটোরায় ওলামা কেরামদের বিশেষ মজলিসে এক বয়ানে বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে যেসব প্রতিনিধিদল ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন সবগুলো দাওয়াতের উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছিলেন।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেহাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ২৩টি আর এক রিওয়ায়েত মতে ৩৯টি।[১]

এর মধ্যে নয়টি সম্পর্কে লিখা হয়েছে بعث مقا تلا (যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছেন) অবশিষ্ট সব কয়টির ব্যাপারে লিখা হয়েছে যে, দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফী আযীযী)

সত্যি আশ্চর্য হয় যে, ওলামা কেরাম কি করে 'ফী সাবিলিল্লাহ' শব্দটিকে যুদ্ধের সাথে নির্দিষ্ট করেন, অথচ কুরআন ও হাদীছে এর ব্যাপকতার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন লক্ষ্য করুন পবিত্র কুরআনের আয়াত انما الصدقات للفقراء এতে 'ফী সাবীলিল্লাহ'-র ব্যাখ্যায় ওলামা কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আওজাযুল মাসালেকের তৃতীয়খণ্ডে এর বিশদ আলোচনা রয়েছে। যেমন, আল্লামা রাজী (রহঃ)-এর মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে জেহাদ করা। ইমাম মালেক প্রমুখ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সকল নেক আমল। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রচেষ্টাই এর অন্তর্ভুক্ত।

মিশকাত শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, একবার জনৈক সাহাবী এসে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জেহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সাহাবী আরয করলেন, জি হ্যাঁ; জীবিত আছেন। ইরশাদ করলেন, তবে তাঁদের মধ্যেই জিহাদ করো। অর্থাৎ, তাঁদের খেদমত কর। লক্ষ্য করুন; এখানে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১। এখানে সংখ্যা লিখতে গিয়ে কাতেবের ভুল হয়ে গিয়েছে। সঠিক সংখ্যা হবে ১৯ আর ২৭।

পিতা-মাতার খেদমতকেও জিহাদ বলে আখ্যায়িত করছেন।

মিশকাত শরীফে হযরত খুরায়েম বিন ফাতেক (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি কোন কিছু খরচ করে, তা বৃদ্ধি পেয়ে সাত শ' গুণে পরিণত হয়।

মোটকথা, এসব রিওয়ায়েতগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহর রাস্তা বলতে শুধু যুদ্ধ বিগ্রহই বুঝায় না। তাহলে তাবলীগী সফরে খরচ করার ফযীলত প্রসঙ্গে এ হাদীছগুলো পেশ করাতে অপরাধটা কি হল? অনুরূপভাবে আর একটি হাদীছে হযরত আলী, আবুদ্ দারদা, আবু হুরায়রাহ, আবু উমামাহ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আমর, জাবের বিন আব্দুল্লাহ ও ইমরান বিন হুসাঈন (রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী বসে থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দিবে সে প্রতিটি দিরহামের পরিবর্তে সাত শ' দিরহাম লাভ করবে। আর যে স্বয়ং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে বের হয়ে খরচ করবে সে সাত লক্ষ দিরহামের ছওয়াব লাভ করবে। কোন সন্দেহ নেই যে, তাবলীগী সফর এবং মাদ্রাসার চাঁদা এর অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরে মাযহারীতে

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله

এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

الجهاد او غير ذلك من ابواب الخير

জিহাদ ও অন্যান্য নেক আমল।

অনুরূপভাবে

الذين احصروا فى سبيل الله

এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

فى تحصيل العلوم الظاهرة

অর্থাৎ সাবীলুল্লাহ অর্থ যাহেরী ও বাতেনী ইলম অর্জন।

বুলন্দ করা উদ্দেশ্য।

মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) নাটোরায় ওলামা কেরামদের বিশেষ মজলিসে এক বয়ানে বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে যেসব প্রতিনিধিদল ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন সবগুলো দাওয়াতের উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছিলেন।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেহাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ২৩টি আর এক রিওয়ায়েত মতে ৩৯টি।[১]

এর মধ্যে নয়টি সম্পর্কে লিখা হয়েছে بعث مقا تلا (যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছেন) অবশিষ্ট সব কয়টির ব্যাপারে লিখা হয়েছে যে, দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফী আযীযী)

সত্যি আশ্চর্য হয় যে, ওলামা কেরাম কি করে 'ফী সাবিলিল্লাহ' শব্দটিকে যুদ্ধের সাথে নির্দিষ্ট করেন, অথচ কুরআন ও হাদীছে এর ব্যাপকতার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন লক্ষ্য করুন পবিত্র কুরআনের আয়াত انما الصدقات للفقراء এতে 'ফী সাবীলিল্লাহ'-র ব্যাখ্যায় ওলামা কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আওজাযুল মাসালেকের তৃতীয়খণ্ডে এর বিশদ আলোচনা রয়েছে। যেমন, আল্লামা রাজী (রহঃ)-এর মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে জেহাদ করা। ইমাম মালেক প্রমুখ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সকল নেক আমল। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রচেষ্টাই এর অন্তর্ভুক্ত।

মিশকাত শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, একবার জনৈক সাহাবী এসে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জেহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সাহাবী আরয করলেন, জি হ্যাঁ; জীবিত আছেন। ইরশাদ করলেন, তবে তাঁদের মধ্যেই জিহাদ করো। অর্থাৎ, তাঁদের খেদমত কর। লক্ষ্য করুন; এখানে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১। এখানে সংখ্যা লিখতে গিয়ে কাতেবের ভুল হয়ে গিয়েছে। সঠিক সংখ্যা হবে ১৯ আর ২৭।

পিতা-মাতার খেদমতকেও জিহাদ বলে আখ্যায়িত করছেন।

মিশকাত শরীফে হযরত খুরায়েম বিন ফাতেক (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি কোন কিছু খরচ করে, তা বৃদ্ধি পেয়ে সাত শ' গুণে পরিণত হয়।

মোটকথা, এসব রিওয়ায়েতগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহর রাস্তা বলতে শুধু যুদ্ধ বিগ্রহই বুঝায় না। তাহলে তাবলীগী সফরে খরচ করার ফযীলত প্রসঙ্গে এ হাদীছগুলো পেশ করাতে অপরাধটা কি হল? অনুরূপভাবে আর একটি হাদীছে হযরত আলী, আবুদ্ দারদা, আবু হুরায়রাহ, আবু উমামাহ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আমর, জাবের বিন আব্দুল্লাহ ও ইমরান বিন হুসাঈন (রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী বসে থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দিবে সে প্রতিটি দিরহামের পরিবর্তে সাত শ' দিরহাম লাভ করবে। আর যে স্বয়ং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে বের হয়ে খরচ করবে সে সাত লক্ষ দিরহামের ছওয়াব লাভ করবে। কোন সন্দেহ নেই যে, তাবলীগী সফর এবং মাদ্রাসার চাঁদা এর অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরে মাযহারীতে

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله

এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

الجهاد او غير ذلك من ابواب الخير

জিহাদ ও অন্যান্য নেক আমল।

অনুরূপভাবে

الذين احصروا فى سبيل الله

এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

فى تحصيل العلوم الظاهرة

অর্থাৎ সাবীলুল্লাহ অর্থ যাহেরী ও বাতেনী ইলম অর্জন।

মিশকাত শরীফে তিরমিযী ও দারিমীর সূত্রে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য ঘর থেকে বের হবে, সে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় আছে বলেই গণ্য হবে।

মিশকাতের টীকায় লিখা রয়েছে, "অর্থাৎ যে ইলম অন্বেষণের জন্য বের হয়, সে জেহাদে বের হওয়ার ছওয়াব পায়। কেননা, তালেবুল ইলমও মুজাহিদের ন্যায় দ্বীন জিন্দা করার জন্য এবং শয়তানকে অপদস্থ করার জন্য সাধনা করে এবং বিভিন্ন দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব কিছু তাবলীগের সফরেও পাওয়া যায়।

'এতেদাল' গ্রন্থে এ ধরনের রিওয়ায়েত প্রচুর পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, উত্তম জিহাদ হল জালিম বাদশাহর সামনে হক কথা বলা। আর জালিম বাদশাহ কাফির হওয়া আবশ্যক নয়, বরং জালিম বাদশাহ মুসলমান হলেও তার সামনে হক কথা বলা এ হাদীছের আওতাভুক্ত হবে। তবে প্রধানশর্ত হল, এসব চেষ্টা সাধনা একমাত্র আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে হতে হবে। যেমন ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে।

অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে, প্রকৃত জিহাদ হল, যা একমাত্র আল্লাহ পাকের নাম বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে করা হয়। 'এতেদাল' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৩২৮ হিজরী সালে মাযাহেরুল উলূম মাদ্রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণকালে চাঁদার আবেদন করে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর লিখা এবং হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ) ও হযরত শাহ আব্দুর রহীম (রহঃ)-এর সত্যায়িত একখানা পত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। মাওলানা লিখেনঃ

> "আমি এ বিষয়ে একমত যে, মাদ্রাসার ছাত্রাবাস এই মুহূর্তে 'বাকিয়াতে সালেহাত' (অর্থাৎ সদকায়ে জারিয়া)-র অন্যতম একটি খাত। সহী হাদীছে মৃত্যুর পর যে সব আমলের ছওয়াব বরাবর জারী থাকে বলে বলা হয়েছে। সেসব আমলের মধ্যে মুসাফিরের জন্য ঘর নির্মাণ করা'ও উল্লেখ রয়েছে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তালেবুল ইলমগণও নিঃসন্দেহে মুসাফির; বরং উত্তমতম মুসাফির।

> কেননা, এরা আল্লাহর রাস্তার মেহমান। সুতরাং সাধারণ মুসাফির এর সাহায্যই যদি এতটুকু ফযীলতপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর রাস্তার মেহমানদের খেদমতের ফযীলত কতটুকু হবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আল্লাহর রাস্তার সকল খাতে এবং বিশেষতঃ ইলমের দৈন্যতার এ আশংকাজনক মুহূর্তে বিশেষ এই খাতে দান করা সবচে' বেশী ফযীলতের কাজ। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই মুহূর্তে ছাত্রাবাস নির্মাণ সর্বোত্তম 'বাকিয়াতে সালেহাত'। আশা করি সকল মুসলমান ভাই সাধ্যানুযায়ী এ সুযোগকে হাতছাড়া করবেন না এবং কম-বেশী অবশ্যই এতে অংশগ্রহণ করবেন।
>
> ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্‌তাবায়াল হুদা"
>
> **বান্দা আশরাফ আলী থানুভী**

সত্যায়ণ

নিঃসন্দেহে হযরত আশরাফ আলী থানুভী যা কিছু লিখেছেন, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সংগত।

বান্দা আব্দুর রহীম (উফিয়া আনহু)

সত্যায়ণ

মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী যা কিছু লিখেছেন তা সত্য ও নির্ভুল।

বান্দা মাহমুদ (উফিয়া আনহু)

এই দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে শুধু প্রচলিত জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করেন তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' শুধু প্রচলিত জিহাদের মধ্যে সীমিত নয়। তফসীরে মাজহারীতে قل قتال فيه এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে سبيل الله অর্থ الاسلام ইসলাম ও আনুগত্য লিখেছেন। এ ছাঁড়াও উক্ত তফসীর গ্রন্থে অসংখ্য জায়গায় আল্লাহর রাস্তা বলতে 'আল্লাহর আনুগত্য করা' বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বাধা দানকারীদের সাথে সামর্থ্য থাকলে এবং কোন ফিৎনার আশংকা না থাকলে কঠোরতা করাতে কোন ক্ষতি নেই।

আমার সবচে' বেশী আশ্চর্য হয়, উপরোক্ত তিন বুযুর্গের অনুসারীদের মুখ থেকে যখন তাবলীগী জামাতের লোকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনি যে, "এরা আল্লাহর রাস্তার হাদীছগুলো তাবলীগে সময় লাগানোর সাথে এনে জুড়ে দেন। অথচ আল্লাহর রাস্তা অর্থ শুধু জিহাদ"।

যাহোক, এই অধমের দৃষ্টিতে আল্লাহর রাস্তার ফযীলত সংক্রান্ত সকল আয়াত ও হাদীছের সাথে প্রচলিত তাবলীগের সফরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়াতে আপত্তির কিছু নেই এবং আমার এই ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে কোন মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরের উক্তিতেই আল্লাহর রাস্তা শব্দটি শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত বলে পাইনি। তাই তাবলীগী ভাইদের প্রচলিত তাবলীগে সময় লাগানোর ফযীলত বয়ান প্রসঙ্গে এসব আয়াত ও হাদীছকে দলীল হিসেবে পেশ করা অসংগত নয়।

এই বিষয়টি যৌবনকালে অসংখ্য পত্রের জবাবে লিখিয়েছি।

সমালোচনা– ২

তাবলীগী জামাতের প্রচলিত পদ্ধতি

এই প্রসঙ্গেও আমার কাছে বহু পত্র এসেছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এভাবে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে জামাত প্রেরণের প্রচলন ছিল না। তখন জামাত কাফেরদের জন্যই পাঠানো হতো। সুতরাং এ পদ্ধতি বিদআত বৈ কিছুই নয়। এ প্রশ্নেরও অসংখ্য জবাব আমি লিখেছি। এ প্রশ্নটিও আলিমদের মুখে শুনলে আমার খুব আশ্চর্য হয়। এ কথা কারও অজানা নেই যে, 'আমর বিল মা'রুফ নেহী আনিল মুনকার' অবশ্য পালনীয় একটি বিষয়। তাছাড়া ইতিপূর্বের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে, দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে যে কোন প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এরপরও এ উক্তি করা যে, "এ পদ্ধতি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না" প্রথমতঃ মোটেই ঠিক নয়। যেমন, পরবর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাবে।

যদি মেনেও নেয়া হয় যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ প্রচলন ছিল না, তবুও এ কথা স্বীকৃত যে, শরীয়তের কোন নির্দেশ

পালনের জায়েয মাধ্যমগুলোও নির্দেশের আওতাভুক্ত। যেমন ধরুন বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি, খানকার যাবতীয় কার্যক্রম, বই পুস্তক রচনা, টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার এসব প্রচলন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও শরীয়ত সম্মত। কিন্তু বলুন তো; এসব পদ্ধতিগুলো ঠিক এভাবে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল কি? অনুরূপভাবে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তোপ কামানের যুদ্ধ ছিল না বলে এগুলোকে বিদআত বলে দিয়ে কাফেরদের জঙ্গীবিমান আর রাসায়নিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার মত বোকামী কি কেউ করবে?

উপরন্তু, এ কথা মোটেই ঠিক নয় যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলমানদের জন্য এভাবে জামাত প্রেরণের প্রচলন ছিল না। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) প্রণীত হায়াতে সাহাবা গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অধীনে একাধিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও মুসলিম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বিভিন্ন জামাত প্রেরণ করা হত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু' একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

হযরত আসিম বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমল ও কারাহ গোত্রের কতক লোকের অনুরোধে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানকার মুসলমানদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য ছয়জনের একটি জামাত প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) ইরশাদ করেন যে, প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায ও আবু মূসা (রাঃ)-কে ইয়ামান প্রদেশের লোকেদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, একবার পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কায়েস গোত্রীয় এক সম্প্রদায়কে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানে গিয়ে আমি তাদেরকে জংলী উটের মত দেখতে পেলাম। উট আর ছাগল ছাড়া তারা যেন আর কিছুই বুঝে না। আমি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাদের এ দুরবস্থার কথা জানালাম। তিনি ইরশাদ করলেন, আম্মার! এর চেয়েও আশ্চর্যের

কথা শুনবে কি? তারা হল এমন এক সম্প্রদায় যারা দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দ্বীন থেকে উদাসীন থাকবে। যাহোক এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা হায়াতে সাহাবা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

আর এ কথাও স্পষ্ট যে, কাফেরদের কাছেও জামাত তাদের হেদায়েতের জন্যই প্রেরণ করা হত। আর এও জানা কথা যে, অধুনা মুসলিম সম্প্রদায় দ্বীন ও হেদায়েত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুফরির পর্যায় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তার থেকেও অধম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে হেদায়েতের দিকে আহবান করারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর মালফুযাতে তাঁর একটি ইরশাদ উল্লেখিত রয়েছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতপূর্ব দাওয়াতের আমল অর্থাৎ 'লোকদের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়া' মদীনা পৌঁছার পর অনীবার্য কারণে অব্যাহত থাকেনি। বরং সেখানে গিয়ে তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু এটি কখন হয়েছিল? যখন মক্কী জীবনের এ দাওয়াতের আমল সামলে নেয়ার মত এবং তা সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার মত এক বিরাট জামাত তৈরী হয়ে গিয়েছিল এবং তখন পরিস্থিতির দাবী ছিল যে, তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে এ কাজকে আঞ্জাম দেবেন এবং অন্যদের দ্বারা কাজ নিবেন। আর এর ভিত্তিতেই হযরত উমর (রাঃ)-এর জন্য মদীনায় অবস্থান করা তখনই সংগত ছিল যখন রোম ও ইরানে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য হাজার হাজার মর্দে মুজাহিদ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তখন পরিস্থিতির দাবী ছিল যে, একজন শাসক মারকাযে বসে এ হক্বের দাওয়াত ও আল্লাহর পথে জেহাদের পূর্ণ বিষয়টি পরিচালনা করবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী (রহঃ)-এর ভাগ্নে হযরত মাওলানা জাফর আহমদ থানুভী (রহঃ) হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর শেষ বয়সে তার ইয়াদত (অসুস্থতার সময় খোঁজ খবর নিতে) গেলেন। ইতিপূর্বে তিনি তার সাথে নিজামুদ্দীনে এক চিল্লা দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) তাকে সে অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, আপনার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ আছে কি? এ কথার উপর তিনি হযরতের মৃত্যু পর্যন্ত নিযামুদ্দীনেই অবস্থান করেন। হযরতের তখন কঠিন অসুস্থতার কারণে

একাধারে দীর্ঘ সময় কথা বলা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল।

একবার হযরত বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম যুগে যখন দ্বীন ছিল অত্যন্ত দুর্বল, দুনিয়া ছিল শক্তিশালী, তখন অনাগ্রহী লোকেদের ঘরে ও মজলিশে গিয়ে তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। তাদের পক্ষ থেকে আহবানের অপেক্ষা করতেন না। অনেক সময় সাহাবা কেরামকে নিজে থেকেই তাবলীগের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতেন। তখনকার মত এখনও গোটা সমাজে ঈমান ও আমলের দৈন্যতা বিরাজ করছে। সুতরাং আমাদেরও অনাগ্রহী লোকদের কাছে অনুরূপভাবে মুলহিদ ও ফাসেকদের সমাবেশে গিয়ে হক কথা বুলন্দ করতে হবে (এ কথা বলার পর হযরত মাওলানার পীড়া বেড়ে গেলে আর কথা বলতে পারছিলেন না)। তখন মাওলানা জাফর আহমদকে লক্ষ্য করে বললেন, মাওলানা! আপনি আমার কাছে বিলম্বে পৌঁছেছেন। এখন তো বিস্তারিত কিছু বলাও আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। যাহোক যা কিছু বললাম এতটুকুই গভীরভাবে প্রণিধান করতে চেষ্টা করুন।

(মলফুযাতে দেহলুভী)

বস্তুত, হাদীছ ও সীরাতশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অভাবেই মানুষ এ ধরনের উক্তি করে থাকে। অন্যথায় যেমন এই কেবল বলে এসেছি যে, হায়াতে সাহাবায় এ যাতীয় বহু ঘটনা রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য জামাত প্রেরণ করা হত। আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দলের ঘটনা তো সকল হাদীছ গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ।

ঘটনার বিবরণ হলঃ তারা এসে আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের ও আপনার মাঝে 'মুযার' গোত্র অন্তরায় হয়ে আছে। সুতরাং আমরা একমাত্র পবিত্র মাসগুলোতেই আপনার কাছে আসতে পারি। তাই আপনি আমাদের ঈমান সংক্রান্ত এমন কিছু বিষয় বলে দিন যার উপর আমল করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং ফিরে গিয়ে আমাদের সম্প্রদায়কেও জানিয়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ করলেন। আর চারটি বিষয় থেকে বারণ করলেন। যার বিস্তারিত বিবরণ ৬ নং প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে আসবে।

মুসনাদ তায়ালসীর বর্ণনায় এই ঘটনাটিতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা গিয়ে তোমাদের সম্প্রদায়কে এসব বিষয়ে দাওয়াত দিবে। (হায়াতুস্ সাহাবা)

হায়াতুস্ সাহাবাতেই মুসতাদরাক ইমাম হাকেমের বরাতে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আল-কামাহ বিন হারিছ বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের সাত ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে? আমরা আরয করলাম, আমরা মুমিন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, সব বিষয়েরই হাকীকত থাকে। বলত, তোমাদের ঈমানের হাকীকত কি? আমরা আরয করলাম, পনেরটি জিনিস, যার পাঁচটি আপনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আর পাঁচটি আপনার দূতের মাধ্যমে পেয়েছি।

হাদীছটি সুদীর্ঘ তবে এখানে আমার এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক মারফত অনেক সময় বিভিন্ন নির্দেশ প্রেরণ করতেন।

বিখ্যাত ইতিহাস ও সীরাত বিশারদ মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত সাওয়ানেহে দেহলুভীর ভূমিকা থেকে কিছু অংশ হযরত সৈয়দ সাহেবের আলোচনা প্রসঙ্গে সামনে আসছে। এতে তিনি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দাওয়াতের উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলোর একটি হল, 'আরজ' অর্থাৎ কারো আগমনের অপেক্ষা না করে তিনি এবং তার অন্যান্য দায়ীরা নিজেই লোকদের কাছে পৌঁছে যেতেন। এমনকি অনেক সময় লোকদের বাড়ী বাড়ী পর্যন্ত হকের দাওয়াত নিয়ে পৌঁছে যেতেন (এ আলোচনা বেশ দীর্ঘ যা সামনে আসছে)।

যাহোক, এরপর তিনি বলেন, এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, দায়ী এবং মুবাল্লেগের জন্য আবশ্যক, নিজেই লোকদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে হকের দাওয়াত পৌঁছানো। (মুকাদ্দামা সাওয়ানেহে হযরত দেহলুভী)

একবার দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তো দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে কাফেরদের কাছে যাওয়া হত। এখনকার মত এভাবে

মুসলমানদের কাছে জামাত যাওয়ার কোন প্রমাণ কি হাদীছ শরীফে আছে? থাকলে কিতাবের হাওয়ালাসহ লিখুন। জবাবে মুফতী সাহেব লিখেছেন, ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবা কেরাম দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কুফা ও 'কারকীসিয়া' গমন করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রহঃ) প্রমুখের এক জামাত সিরিয়ায় প্রেরণ করেছেন। এসব জামাত মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করেই প্রেরিত হয়েছিল। [ইযালাতুল খাফা]

বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মুফতী সাহেব রচিত 'কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হাঁয়?' দেখা যেতে পারে।

সমালোচনা– ৩

মাদ্রাসা ও খানকার প্রয়োজনীয়তার অস্বীকার

এ প্রশ্নও বেশ শুনা যায় যে, তাবলীগী জামাতে মাদ্রাসা ও খানকাকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রচার করা হয়। আমার ধারণায় এ প্রশ্নের মূল উৎস তাবলীগী জামাত সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা চিত্তের অনুদারতা। অন্যথায় তাবলীগী জামাতের মূল ছয়টি উসূলের একটি অন্যতম উসূল হল ইলম ও যিকির। তাছাড়া এ জামাতের উদ্যোক্তা হযরত দেহলুভী (রহঃ) এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এ বিষয়ের প্রতি যতটা গুরুত্বারোপ করতেন আর কোন বিষয়ের প্রতি এরূপ করতেন বলে আমার জানা নেই। হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর এ বক্তব্য তো সুপ্রসিদ্ধ যা তিনি প্রায় বলতেন যে, আমার এ আন্দোলনের জন্য ইলম ও যিকির দু'টি ডানা তুল্য; তার একটিও ভেঙ্গে গেলে পাখীর জন্য উড়া মুশকিল।

এ সমালোচকরা যদি হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত মাওঃ ইউসুফ (রহঃ)-এর জীবনী ও তাঁদের মলফূযাত দেখার শ্রমটুকু স্বীকার করতেন, তাহলে হয়ত তাদের কলম ও কালাম থেকে এ ধরনের উক্তি বের হত না। হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর মলফুযাতে রয়েছে–

১। হযরত থানুভী (রহঃ)-এর ভাগনে হযরত মাওঃ যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) তাঁর নিযামুদ্দীন অবস্থানকালে হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর যে মালফুযাত

লিপিবদ্ধ করেছিলেন যা হযরতের মলফুযাতেও সংকলিত হয়েছে; তাতে তিনি একবার বলেন, আমার এ আন্দোলনে ইলম ও যিকিরের গুরুত্ব অনেক বেশী। ইলম ছাড়া না আমল হতে পারে আর না আমলের পরিচয় লাভ হতে পারে। আর যিকির ছাড়া ইলমের নূর হাসিল হতে পারে না; বরং যিকির ছাড়া ইলম অন্ধকার বৈ কিছুই নয়। (হযরত মাওঃ যাফর আহমদ (রহঃ) বলেন,) আমি বললাম, হযরত! স্বয়ং তাবলীগই তো একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল সুতরাং তাবলীগ করতে গিয়ে ইলমের পরিমাণ যদি কিছুটা কমে যায় তবে তার দৃষ্টান্ত তো এরূপ যেমন, হযরত সৈয়্যদ সাহেব বেরুলুভী (রহঃ) যখন জিহাদের প্রস্তুতি নিলেন তখন তিনি তাঁর কর্মীদের যিকির আযকারের পরিবর্তে যুদ্ধ প্রশিক্ষণে ব্যস্ত করে দিলেন। এতে অনেকে আপত্তি তুলল যে, হযরত এ সময় পূর্বের ন্যায় নূর পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হযরত বেরুলুভী (রহঃ) জবাব দিলেন, হ্যা এখন যিকিরের নূর নেই ঠিকই কিন্তু জিহাদের নূর অবশ্যই রয়েছে। আর এই মুহূর্তে এরই তীব্র প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত দেহলুভী (রহঃ) বললেন, এরপরও আমার ইলম ও যিকিরের দৈন্যতার কারণে অস্থিরতা অনুভব হচ্ছে। আর এ দৈন্যতার কারণ হল, এখন পর্যন্ত আহলে ইলম ও আহলে যিকির এতে অংশ গ্রহণ করছেন না। এরা যদি এ কাজ সামলে নিতেন তাহলে এ ঘাটতি পূরণ হয়ে যেত। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ জামাতে আহলে ইলম ও আহলে যিকিরের সংখ্যা অনেক কম।

ব্যাখ্যা ঃ এখন পর্যন্ত যেসব জামাত বাইরে পাঠানো হয় এতে আহলে ইলম ও আহলে যিকিরের সংখ্যা নেই বললেই চলে। যার কারণে হযরত অস্থির ছিলেন। আহলে ইলম ও আহলে যিকির যদি এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করতেন তা হলে কতই না ভাল হত।

অবশ্য আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে মারকাযে আহলে ইলম ও আহলে নিসবত (আল্লাহওয়ালা) রয়েছেন। কিন্তু এদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এরা যদি মারকায ছেড়ে বাইরে চলে যান, তাহলে মারকায সামলানোর লোক থাকে না। [মালফুযাত]

২। একদিন ফযরের পর নিযামুদ্দীনের মসজিদে পুরাতন সাথীদের বিশাল এক মাজমা'আ ছিল। হযরত মাওলানা শারীরিকভাবে তখন এত দুর্বল ছিলেন

যে, শুয়ে শুয়েও উচ্চস্বরে কিছু বলার মত সামর্থ্য ছিল না। তাই একজন বিশেষ খাদেমকে তলব করে তার মাধ্যমে পুরা মাজমাআকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের এ নকল-হরকত, চেষ্টা-সাধনা বিফল যাবে যদি আপনারা ইলম ও যিকিরের প্রতি পূর্ণভাবে মনোনিবেশ না করেন। বরং এ দু'টি বিষয়ে অবহেলা করলে এ সকল সাধনা ফিৎনা ও গোমরাহীতে পরিণত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে।

ইলমে দ্বীন ছাড়া ইসলাম ও ঈমান নিছক নাম ও আনুষ্ঠানিকতা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহর যিকির ছাড়া ইলম নিরেট অন্ধকার। অনুরূপভাবে ইলমে দ্বীন ছাড়া প্রচুর পরিমাণে জিকিরেও মারাত্মক আশঙ্কা রয়েছে।

মোটকথা, যিকিরের মাধ্যমে ইলমে নূর আসে আর ইলমে দ্বীন ছাড়া যিকিরের প্রকৃত বরকত ও ফল লাভ হয় না। বরং অনেক সময় এ ধরনের জাহেল সুফীদেরকে শয়তান নিজের হাতিয়ার বানিয়ে নেয়। সুতরাং এ কাজের সাথে ইলম ও যিকিরের গুরুত্বের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়; বরং এ ব্যাপারে সর্বদা যত্নবান থাকা উচিত। অন্যথায় তাবলীগের আন্দোলন নিছক তামাশার আকার ধারণ করবে এবং আল্লাহ না করুন আপনাদের মারাত্মক রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

৩। একবার তিনি ইরশাদ করেন, আমি প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরণের যিকিরের তালীম দিয়ে থাকি (তার পর তিনি কিছু ওযায়েফের আলোচনা করে বললেন,) যিকির ছাড়া ইলম অন্ধকার বৈ কিছুই নয়। আর ইলম ছাড়া যিকির অসংখ্য ফিৎনার দরজা।

৪। একবার ইরশাদ করেন, দু'টি বিষয়ে আমি বেশ চিন্তিত। সুতরাং এ দুটি বিষয়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। একটি হল যিকির, যে ব্যাপারে আমার জামাতে বেশ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে যিকির শিক্ষা দেয়া উচিত। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, বিত্তশালীদের যাকাত যথাস্থানে ব্যয় হচ্ছে না। অধিকাংশই বেকার নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে যাকাতের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উচিত। (সুদীর্ঘ আলোচনার অংশবিশেষ।)

৫। ইরশাদ করেন, ইলম থেকে আমল জন্ম নেয়া উচিত এবং আমল থেকে যিকির জন্ম নেয়া উচিত। তবেই ইলম প্রকৃত ইলমরূপে আর আমল

প্রকৃত আমলরূপে গণ্য হবে। ইলম থেকে যদি আমল জন্ম না নেয়, তাহলে তা নিছক অন্ধকার। আর আমল থেকে যদি আল্লাহর স্মরণ জন্ম না নেয়, তা হলে তা ঠুঙ্ক। আর ইলম ছাড়া যিকিরও ফিতনা।

৬। শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকির দূর্গ ও সুসংরক্ষিত প্রাচীর তুল্য। সুতরাং দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কোন খারাপ পরিবেশে যেতে হলে সে পরিবেশ যত খারাপ হবে ততই বেশী পরিমাণ যিকিরের প্রতি যত্নবান হতে হবে, যাতে মানব-দানব সব ধরনের শয়তানের প্রভাব থেকে পরিত্রাণ লাভ হয়।

৭। ইরশাদ করেন, আমি সব সময় মেওয়াত যাওয়ার সময় নেককার ও যাকেরীনদের জামাতের সাথে যেয়ে থাকি তার পরও সাধারণ পরিবেশের সাথে মেলা মেশার কারণে মনের মধ্যে যে ময়লা পড়ে যায় তা ই'তিকাফের দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত কিংবা কিছু দিন সাহারানপূর বা রায়পুরের বিশেষ পরিবেশে না কাটানো পর্যন্ত তা পরিষ্কার হয় না।

অন্যদেরও তিনি মাঝে মধ্যে বলতেন যে, দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যারা সফর করে তাদের উচিত গাস্তের সময় কিংবা অন্য কোন সময় বাহিরের পরিবেশে ঘুরা ফিরার কারণে মনে যে প্রভাব পড়ে তা নিভৃতে এবং একাকিত্বে যিকির ও ফিকিরের মাধ্যমে ধৌত করে নেয়া।

৮। ইরশাদ করেন, ইলম ও যিকিরকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরা একান্ত অপরিহার্য্য। (এরপর তিনি ইলম ও যিকিরের হাকীকত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন, যাতে তিনি বলেন,) ইলম নিছক জানার নাম নয়। লক্ষ্য কর, ইহুদী সম্প্রদায় তাদের নিজেদের শরীয়ত ও আসমানী ইলম সম্পর্কে কতখানি জ্ঞানের অধিকারী ছিল; রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েবের নায়েবদের হুলিয়া ও আকার অবয়ব এমনকি নবীজীর শরীরের তিল সম্পর্কে পর্যন্ত অবগত ছিল। কিন্তু এসব ইলম তাদের কি কাজে এসেছে?

এখানে এই কয়েকটি উপদেশ বাণী লিখা হল। এছাড়াও হযরত দেহলুভী (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা ইয়ূসুফ (রহঃ)-এর বয়ান, উপদেশবাণী ও চিঠিপত্র প্রচুর পরিমাণে সংকলিত হয়েছে। মেওয়াতের জিম্মাদারদের নামে লেখা হযরতের একটি চিঠির আংশিক এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনাদের এক এক বৎসরের জন্য আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানোর সংবাদ পেয়ে এতটুকু আনন্দিত হয়েছি যা পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার মত নয়। আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং আরো তৌফীক দান করুন। এখানে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(ক) প্রত্যেকে নিজ নিজ হালকার একটি ফিরিস্তি তৈরী করে আমার কাছে এবং হযরত শায়খুল হাদীছের কাছে পাঠিয়ে দিন যে, কারা যিকির আরম্ভ করেছে আর কারা আগে থেকেই করছে আর কারা ছেড়ে দিয়েছে।

(খ) যারা বাইআত হয়েছে তারা বাইআতের পর বাতলে দেয়া সবকের উপর কতখানি আমল করছে।

(গ) প্রত্যেক মারকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মকতবগুলোর প্রতি দেখা-শুনা করা এবং যেখানে নেই প্রয়োজনমতে নতুন মকতব কায়েম করা আবশ্যক।

(ঘ) আপনারা নিজেরাও রীতিমত যিকির ও তালীমের আমল আরম্ভ করেছেন কিনা? না করে থাকলে এ অবহেলার কারণে অনুতপ্ত হয়ে সত্তর আরম্ভ করে দিন।

'ক' এর পেরা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য; যাদেরকে বারো তাসবীহের সবক দেয়া হয়েছে তারা পাবন্দীর সাথে পুরণ করছে কিনা আর তারা কি আমার কাছে জেনে এ আমল আরম্ভ করেছে, না অন্য কাউকে দেখে আমল শুরু করেছে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে বিস্তারিত লিখুন।

(ঙ) নিজেদের মারকাযগুলো থেকে প্রত্যেক নাম্বারের বিস্তারিত কারগুজারী লিখে আমার নামে এবং হযরত শায়খুল হাদীছের নামে লিখে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

(চ) যারা বারো তাসবীহ রীতিমত পালন করছে তাদেরকে রায়পুর গিয়ে এক চিল্লা কাটানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

(ছ) বন্ধুগণ! আপনাদের আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানোর মূল লক্ষ্য হল তিনটি বিষয়কে জীবিত করা, যিকির, তালীম, তাবলীগ অর্থাৎ তাবলীগের জন্য বের হয়ে তাদেরকে যিকির ও তালীমের পাবন্দ করা। (মাকাতীব)

'সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী' (হযরত মাওঃ ইয়ূসুফ (রহঃ)-এর জীবন চরিত)-তে লিখা রয়েছে যে, তিনি তাওহীদ ও নামাযকে এ কাজের বুনিয়াদ মনে করতেন। তার বক্তব্য ছিল ইলম ও যিকির হল দাওয়াত ও তাবলীগের এ আন্দোলনের জন্য দু'টি ডানা তুল্য। এ ছাড়াও তিনি তাঁর বয়ানে এবং চিঠি পত্রের মাধ্যমে সর্বদা এ দু'টি বিষয়ের প্রতি জোর তাগীদ দিতেন। তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ এক চিঠিতে লিখেনঃ

"ইলম ও যিকির এই কাজের দু'টি ডানা তুল্য। এর কোন একটিতে দুর্বলতা কিংবা অবহেলা মূল কাজের জন্য মারাত্মক রকমের হুমকী। প্রত্যেকটিই স্ব স্ব স্থানে একান্ত অপরিহার্য ও আবশ্যকীয়। ইলম ও যিকিরের মারকায হল, মাদ্রাসা এবং খানকা। আমরা আমাদের এ দু'টি ডানাকে শক্তিশালী করার জন্য ওলামা-মাশায়েখদের কাছে সর্ব অবস্থায় সর্বভাবে মুহতাজ। তারা বিশেষতঃ এ দু'টি বিষয়ে আমাদের অনুসরণীয়। এই ইলমে নববী ও নূরে নববীর অধিকারী হওয়ার সুবাদেই তাঁদের কদর করা, তাঁদের খেদমত করা, তাঁদের সান্নিধ্য লাভকে নিজের ইসলাহ ও নাজাতের উপায় মনে করা আমাদের উপর আবশ্যক; এজন্যই ওলামা মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাত করা, তাদের থেকে দু'আ নেয়া, তাদের সামনে তাবলীগের কারগুজারী শুনানো, সৎ পরামর্শ নেয়া তাবলীগের মৌলিক নীতিমালার একটি অন্যতম।

মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব 'সাওয়ানেহে হযরতজী' (হযরত মাওলানা ইয়ুসুফ (রহঃ)-এর জীবনী)-তে লিখেন, একবার আমি হযরত মাওলানার কাছে নিজের মাদ্রাসার ব্যস্ততার কথা বলে আরজ করলাম যে, হযরত! পড়াতে পড়াতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। এখন ইচ্ছা হয় কাউকে নিজের পড়ানোর দায়িত্ব সঁপে দিয়ে কিছু দিনের জন্য তাবলীগে বের হয়ে যাবো। জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন, কস্মিনকালেও নয়, তাবলীগের আগেও এ কাজ করতে হবে এবং তাবলীগের পরও করতে হবে।

মানুষের ধারণা; আমরা মাদ্রাসার বিরোধিতা করি। কস্মিনকালেও নয়; সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা বরং মাদ্রাসায় পড়ানোকে বুনিয়াদী কাজ মনে করি। শুধু তাই নয় নিজেও শিক্ষকতা করি। আমাদের তো ইচ্ছা, মাদ্রাসায় পড়ানোর পাশা-পাশি তাবলীগের কাজটিকে জুড়ে নিবো। (সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী আযীযী)

হযরত দেহলুভী (রহঃ) তার এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেন, সকাল-সন্ধ্যা এবং নিজের অবস্থা মাফিক রাতের কিছু অংশ ইলম ও যিকির হাসিল করার পিছনে ব্যয় করবে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর জীবনীতে হযরত মাওঃ আলী মিয়া লিখেন, "তিনি মেওয়াতীদের দেওবন্দ, সাহারানপুর, রায়পুর ও থানাভুনের দিকে পাঠাতে আরম্ভ করেন এবং এ হিদায়েত দিয়ে দেন যে, বুযুর্গদের মজলিসে তাবলীগের আলোচনা করবে না। ৫০/৬০ জন আশে-পাশের গ্রামে গাস্ত করবে। অষ্টম দিন শহরে সমবেত হবে। তারপর সেখান থেকে পুনরায় গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য ওলামা কেরাম যদি নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তাদের সামনে নিজেদের হালাত পেশ করবে; নিজে থেকেই কিছু বলবে না।"

হযরত মাওলানা একবার শায়খুল হাদীছ মাওঃ মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেবের নামে লিখা এক চিঠিতে লিখেন, বহুদিন ধরে আমার মনের বাসনা ছিল যে, এই জামাতগুলো বিশেষ উসূলের পাবন্দীর সাথে (হক্কানী) পীর মাশায়েখদের কাছে গিয়ে তাঁদের খানকার যাবতীয় আদব বজায় রেখে খানকার ফয়য লাভ করুক এবং কিছু সময় আশেপাশের গ্রামগুলোতে তাবলীগের কাজও জারী থাকবে। এ ব্যাপারে যারা আসবে তাদের সাথে পরামর্শ করে রুটিন তৈরী করে নিবেন।

খুব সম্ভব আমিও কতক দ্বীন-দরিদ্রদের নিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যে আসব। দেওবন্দ ও থানাভুনও যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

মাওলানা ইয়ূসুফ সাহেব (রহঃ) তার সকল মুতাআল্লেকীন ও তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বরাবর দেওবন্দে হযরত মাদানী (রহঃ)-এর খেদমতে এবং রায়পুরে হযরত মাওঃ আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরী (রহঃ)-এর খেদমতে গিয়ে কিছু সময় কাটানোর এবং অধিক পরিমাণ ফায়দা হাসিল করার জন্য বিশেষভাবে তাগীদ করতেন। (হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর মৃত্যু তো তাঁর সময়ের আগেই হয়ে গিয়েছিল।)

লক্ষ্য করুন, তিনি তাঁর এক পুরাতন বন্ধুকে লিখা এক চিঠিতে কতটুকু গুরুত্বের সাথে এ বিষয়ে হিদায়েত দিচ্ছেন। তিনি লিখেন, আপনার ব্যাপারে পরামর্শের পর রায়পুর অবস্থানেরই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুতরাং আপনি এক চিল্লা

'সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী' (হযরত মাওঃ ইয়ূসুফ (রহঃ)-এর জীবন চরিত)-তে লিখা রয়েছে যে, তিনি তাওহীদ ও নামাযকে এ কাজের বুনিয়াদ মনে করতেন। তার বক্তব্য ছিল ইলম ও যিকির হল দাওয়াত ও তাবলীগের এ আন্দোলনের জন্য দু'টি ডানা তুল্য। এ ছাড়াও তিনি তাঁর বয়ানে এবং চিঠি পত্রের মাধ্যমে সর্বদা এ দু'টি বিষয়ের প্রতি জোর তাগীদ দিতেন। তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ এক চিঠিতে লিখেনঃ

"ইলম ও যিকির এই কাজের দু'টি ডানা তুল্য। এর কোন একটিতে দুর্বলতা কিংবা অবহেলা মূল কাজের জন্য মারাত্মক রকমের হুমকী। প্রত্যেকটিই স্ব স্ব স্থানে একান্ত অপরিহার্য ও আবশ্যকীয়। ইলম ও যিকিরের মারকায হল, মাদ্রাসা এবং খানকা। আমরা আমাদের এ দু'টি ডানাকে শক্তিশালী করার জন্য ওলামা-মাশায়েখদের কাছে সর্ব অবস্থায় সর্বভাবে মুহতাজ। তারা বিশেষতঃ এ দু'টি বিষয়ে আমাদের অনুসরণীয়। এই ইলমে নববী ও নূরে নববীর অধিকারী হওয়ার সুবাদেই তাঁদের কদর করা, তাঁদের খেদমত করা, তাঁদের সান্নিধ্য লাভকে নিজের ইসলাহ ও নাজাতের উপায় মনে করা আমাদের উপর আবশ্যক; এজন্যই ওলামা মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাত করা, তাদের থেকে দু'আ নেয়া, তাদের সামনে তাবলীগের কারগুজারী শুনানো, সৎ পরামর্শ নেয়া তাবলীগের মৌলিক নীতিমালার একটি অন্যতম।

মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব 'সাওয়ানেহে হযরতজী' (হযরত মাওলানা ইয়ুসুফ (রহঃ)-এর জীবনী)-তে লিখেন, একবার আমি হযরত মাওলানার কাছে নিজের মাদ্রাসার ব্যস্ততার কথা বলে আরজ করলাম যে, হযরত! পড়াতে পড়াতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। এখন ইচ্ছা হয় কাউকে নিজের পড়ানোর দায়িত্ব সঁপে দিয়ে কিছু দিনের জন্য তাবলীগে বের হয়ে যাবো। জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন, কস্মিনকালেও নয়, তাবলীগের আগেও এ কাজ করতে হবে এবং তাবলীগের পরও করতে হবে।

মানুষের ধারণা; আমরা মাদ্রাসার বিরোধিতা করি। কস্মিনকালেও নয়; সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা বরং মাদ্রাসায় পড়ানোকে বুনিয়াদী কাজ মনে করি। শুধু তাই নয় নিজেও শিক্ষকতা করি। আমাদের তো ইচ্ছা, মাদ্রাসায় পড়ানোর পাশা-পাশি তাবলীগের কাজটিকে জুড়ে নিবো। (সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী আযীযী)

হযরত দেহলুভী (রহঃ) তার এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেন, সকাল-সন্ধ্যা এবং নিজের অবস্থা মাফিক রাতের কিছু অংশ ইলম ও যিকির হাসিল করার পিছনে ব্যয় করবে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর জীবনীতে হযরত মাওঃ আলী মিয়া লিখেন, "তিনি মেওয়াতীদের দেওবন্দ, সাহারানপুর, রায়পুর ও থানাভুনের দিকে পাঠাতে আরম্ভ করেন এবং এ হিদায়েত দিয়ে দেন যে, বুযুর্গদের মজলিসে তাবলীগের আলোচনা করবে না। ৫০/৬০ জন আশে-পাশের গ্রামে গাস্ত করবে। অষ্টম দিন শহরে সমবেত হবে। তারপর সেখান থেকে পুনরায় গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য ওলামা কেরাম যদি নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তাদের সামনে নিজেদের হালাত পেশ করবে; নিজে থেকেই কিছু বলবে না।"

হযরত মাওলানা একবার শায়খুল হাদীছ মাওঃ মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেবের নামে লিখা এক চিঠিতে লিখেন, বহুদিন ধরে আমার মনের বাসনা ছিল যে, এই জামাতগুলো বিশেষ উসূলের পাবন্দীর সাথে (হক্কানী) পীর মাশায়েখদের কাছে গিয়ে তাঁদের খানকার যাবতীয় আদব বজায় রেখে খানকার ফয়য লাভ করুক এবং কিছু সময় আশেপাশের গ্রামগুলোতে তাবলীগের কাজও জারী থাকবে। এ ব্যাপারে যারা আসবে তাদের সাথে পরামর্শ করে রুটিন তৈরী করে নিবেন।

খুব সম্ভব আমিও কতক দ্বীন-দরিদ্রদের নিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যে আসব। দেওবন্দ ও থানাভুনও যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

মাওলানা ইয়ূসুফ সাহেব (রহঃ) তার সকল মুতাআল্লেকীন ও তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বরাবর দেওবন্দে হযরত মাদানী (রহঃ)-এর খেদমতে এবং রায়পুরে হযরত মাওঃ আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরী (রহঃ)-এর খেদমতে গিয়ে কিছু সময় কাটানোর এবং অধিক পরিমাণ ফায়দা হাসিল করার জন্য বিশেষভাবে তাগীদ করতেন। (হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর মৃত্যু তো তাঁর সময়ের আগেই হয়ে গিয়েছিল।)

লক্ষ্য করুন, তিনি তাঁর এক পুরাতন বন্ধুকে লিখা এক চিঠিতে কতটুকু গুরুত্বের সাথে এ বিষয়ে হিদায়েত দিচ্ছেন। তিনি লিখেন, আপনার ব্যাপারে পরামর্শের পর রায়পুর অবস্থানেরই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুতরাং আপনি এক চিল্লা

নয়; বরং তিন চিল্লা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে হযরতের সান্ধিধ্যে থেকে সেখানকার যাবতীয় আদব বজায় রেখে আল্লাহর যিকিরের আগ্রহ এবং আল্লাহর মহব্বত জন্মানোর চেষ্টা করুন।

আমার পক্ষে তো কিছুই সম্ভব হল না। আপনিই এ মহান দৌলত হাসিল করার জন্য লেগে যান। আল্লাহ্ পাক আপনার সেখানে অবস্থানকে আমাদের নাজাত ও মাগফিরাতের উসীলা করুন। হযরতের খেদমতে সালাম আরজ করে এ অধমের জন্য দু'আর দরখাস্ত করবেন। অন্যান্য মুরীদান ও হযরতের খেদমতে অবস্থানরত সকলের খেদমতেও সালাম ও দু'আর দরখাস্ত রইল।

বান্দা মুহাম্মদ ইয়ূসুফ শুফিরা লাহু

(সাওয়ানেহে ইয়সুফী)

সমালোচনা– ৪

মাদ্রাসার বিরোধিতা

আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, তাবলীগী জামাতের লোকেরা মাদ্রাসার বিরোধিতা করে থাকে। ফলে এদের দ্বারা মাদ্রাসাগুলোর বেশ ক্ষতি হচ্ছে। এ অভিযোগও অত্যন্ত উদ্ভট ও ভিত্তিহীন।

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে তো এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, তাদের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা, ইলম ও যিকিরের গুরুত্ব কতখানি। এরপরও এ মন্তব্য করা নিছক বাতুলতা বৈ কিছুই নয় যে, তাবলীগী জামাতের মাধ্যমে মাদ্রাসার ক্ষতি সাধন হচ্ছে এবং এরা মাদ্রাসা-বিদ্বেষী।

একবার এ অধমের কাছে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ) এরশাদ করলেন, তাবলীগী লোকেরা মাদ্রাসার চাঁদা আদায়ে বাধা প্রদান করে থাকে। আমি আরজ করলাম, নিশ্চয়ই অভিযোগকারী কোন চাঁদা আদায়কারী হবেন? তাদের মুখ থেকেই এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায়। আমি নিজেও যেহেতু মাদ্রাসার সাথে জড়িত; আমার কাছেও অনেক চাঁদা আদায়কারীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযোগ পৌঁছে থাকে।

আমি আরজ করলাম, প্রকৃত বিষয় হল, তাবলীগী মুরুব্বীদের কাছে প্রচুর

লোক-সমাগম হয়ে থাকে এবং তাবলীগী এজতেমাগুলোতেও বিরাট লোক-সমাবেশ ঘটে। ফলে অনেক সময় চাঁদা আদায়কারীরা গিয়ে মুরুব্বীদের কাছে তাদের মাজমাআ থেকে কিছু চাঁদা আদায় করে দেয়ার কিংবা মাজমাআয় এ বিষয়ে তাদেরকে আলোচনা করার সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করেন। আর এঁদের পক্ষে এর কোনটিই রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এঁদের জন্য উচিতও নয়। কেননা চাঁদা চাওয়া এঁদের উসূলের পরিপন্থী।

যাহোক এঁরা যখন অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তখন চাঁদা আদায়কারীরা মন্তব্য করে বসেন যে, এঁরা মাদ্রাসাকে দেখতে পারে না।

আমি হযরতের কাছে আরজ করলাম যে, আমার কাছেও চাঁদা আদায়কারীদের অনেকেই এ ধারনের অভিযোগ নিয়ে এসেছে। তাদের কাছে প্রকৃত বিষয় সন্ধান নিতে গিয়ে এ তথ্যই পেয়েছি যা আরয করলাম। হযরত নিজেও বললেন যে, আমার কাছেও মাদ্রাসার একজন চাঁদা আদায়কারী এ অভিযোগ করেছিলেন।

যাহোক, এ ধরনের প্রশ্ন সাধারণতঃ মাদ্রাসার চাঁদা আদায়কারীদের পক্ষ থেকেই এসে থাকে কিংবা ঐসব লোক করে থাকেন যাঁরা তাদের কাছ থেকে শুনেছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চাঁদা চাওয়া তাবলীগ জামাতের উসূলের পরিপন্থী, আল্লাহ তাঁদেরকে এ উসূলের উপর অনড় থাকার তওফীক দান করুন।

আমাদের মাদ্রাসার মসজিদে কয়েকদিন আগে মাগরিবের পর জনৈক ব্যক্তি এসে ঘোষণা করল যে, "আমি নিজামুদ্দীন থেকে এসেছি। তাবলীগে যাওয়ার নিয়ত করেছি। কিন্তু আমার কাছে ভাড়া নেই, সুতরাং আশা করি দ্বীনদরদী ভাইয়েরা সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করবেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম, এ লোক সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। কেননা, তাবলীগী মারকায থেকে এ ধরনের চাঁদা আদায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ঘোষণার পর লোকটি তৎক্ষণাৎ মসজিদ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু পরে জানা গেল যে, লোকটি এখান থেকে গিয়ে শহরের বিভিন্ন মসজিদে একই কথা বলে

চাঁদা আদায় করেছে।

হযরত থানুভী (রহঃ)-এর মালফুযাতে রয়েছে যে, ওয়ায নসীহত করে চাঁদা চাইলে ওয়াযের তাছীর বাকী থাকে না। দুই-আড়াই ঘন্টার জোরদার মেহনত সামান্য দু' একটি শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ, চাঁদা সংক্রান্ত) শেষ হয়ে যায়। সুতরাং ওলামা কেরামের শুধু দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত থাকা উচিত। তবেই দাওয়াতের আছর অব্যাহত থাকবে। (ইফাযাত)

কলকাতা ও বোম্বাই-এর কতক ব্যবসায়ীর কাছে এক মাদ্রাসার জনৈক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা অভিযোগ করলেন যে, তাবলীগী ভাইদের কারণে মাদ্রাসার চাঁদা আদায়ের বেশ ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। (আরো বিভিন্ন জায়গায় এরা এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।) সব জায়গায়ই এরা একই জবাব দিয়েছে যে, আমরা তো বরং তাবলীগের বরকতেই মাদ্রাসায় চাঁদা দান করছি। আপনি দশ বছর আগের আর এ দশ বছরের রিপোর্ট তুলনা করে দেখুন; এ দশ বছরে আমাদের এলাকা থেকে চাঁদা প্রদানের হার কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে তাঁর মেওয়াতের কতক দ্বীনদারকে লক্ষ্য করে লিখা একটি চিঠি উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেনঃ

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল ধর্মীয় বিষয়াদির জন্য তাবলীগ অর্থাৎ (সঠিক) নিয়মে দেশ-বিদেশ ঘুরে মেহনত করা জমিতে চাষ এবং বৃষ্টি বর্ষণ তুল্য। আর ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়গুলো হল সেই তৈরী জমিতে উৎপন্ন বৃক্ষরাজির যত্ন নেয়ার মত। আর বাগান হাজারো ধরনের হতে পারে। যেমন, খেজুর, আঙ্গুর, আপেল ও বেদানা ইত্যাদি। তবে কোন বাগানই দু'টি মেহনত ছাড়া ফলদায়ক হতে পারে না। প্রথমতঃ আগাছা মুক্ত করে জমিতে চাষ দেয়া। দ্বিতীয়তঃ বাগানের পিছনে যত্ন নেয়া। অনুরূপভাবে দ্বীনের ব্যাপারে তাবলীগের আমল হল জমিতে চাষ দেয়ার মত; আর অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো হল বাগানের যত্ন নেয়ার মত। আর বলাবাহুল্য যে, দ্বীনের জমিগুলো অদ্যাবধি এমন অসমতল ও বিভিন্ন আগাছাপূর্ণ যে, কোন ফসলই তাতে উৎপন্ন হচ্ছে না।

হযরত দেহলুভী (রহঃ) তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর এ তাবলীগী আন্দোলন মাদ্রাসা ও খানকাগুলোর সঠিক উন্নতীর মাধ্যম।

মাওলানা আলী মিয়া (রহঃ) হযরত মাওলানা দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে লিখেন যে, হযরত মাওলানা ধর্মীয় মাদ্রাসাগুলোর বর্তমান মুসলমানদের জন্য একান্ত অপরিহার্য মনে করতেন এবং সমাজের উপর থেকে মাদ্রাসাগুলোর ছত্রছায়া উঠে যাওয়া মারাত্মক রকমের বিপর্যয় ও প্রলয়ের কারণ মনে করতেন।

একবার মেওয়াতের উল্লেখযোগ্য বেশ কতগুলো মাদ্রাসা এবং দ্বীনী মক্তব লোকদের অবহেলার কারণে অকেজো ও বন্ধ হয়ে পড়ে। হযরত মাওলানা জানতে পেরে শায়েখ রশীদ আহমদকে এ মর্মে এক চিঠিতে লিখেনঃ

লোকদের মানস্পটে এ কথা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করুন যে, এভাবে মাদ্রাসাগুলো দুর্বল কিংবা বন্ধ হয়ে পড়লে সকলের জন্য মারাত্মক রকমের বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং এর জন্য সকলকে কঠিন জবাবদেহীর সম্মুখীন হতে হবে যে, এভাবে আমাদের চোখের সামনে কুরআন দুনিয়া থেকে মিটে যাবে আর আমরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করব। একটুও আমাদের মাঝে দরদ থাকবে না। এর জন্য সামান্য অর্থও আমাদের ব্যয় হবে না। সত্যি এটি মারাত্মক রকমের আশঙ্কাজনক বিষয়।

(সাওয়ানেহে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব)

সমালোচনা– ৫

তাবলীগ জামাতের লোকেরা ওলামা বিদ্বেষী

এ প্রশ্নও প্রচুর শোনা যায় যে, তাবলীগের লোকেরা ওলামা কেরামের সাথে অসদাচরণ করে এবং তাঁদের এহতেরাম বজায় রাখে না। এর জবাব হল, তাবলীগ জামাত ভিন্ন কোন দল নয়; বিভিন্ন জামাত ও দলের লোক এখানে সমবেত হয় আর এটাও জানা কথা যে, এ ফিৎনা ফ্যাসাদের যুগে এমন কোন দল বা শ্রেণী নেই যারা ওলামাদের সাথে অসদাচরণ করছে না। সুতরাং পূর্ব থেকেই ওলামা বিদ্বেশী এসব লোকেরা যদি তাবলীগ জামাতে এসে যোগ দেয় তাহলে কি এ কথা বলা সঙ্গত হবে যে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা ওলামা বিদ্বেষী? 'ওলামা বিদ্বেষ' প্রসঙ্গে আমার রচিত এ'তেদাল গ্রন্থে দীর্ঘ ৫০ পৃষ্ঠা ব্যয় করে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এতে এ প্রশ্নটি এবং এর বিভিন্ন কারণ

সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

আমার জানামতে তাবলীগের মারকায থেকে এবং তাবলীগের মুরুব্বীদের পক্ষ থেকে সর্বদা এ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয় যে, ওলামা কেরামের প্রতি যেন পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করা হয় এবং তাদের সাথে কোন প্রকার বে-আদুবী না করা হয়। এরপরও যদি কারো আচরণ উচ্চারণ এর ব্যতীক্রম হয়, তবে সেটা হবে তার ব্যক্তিগত অপরাধ।

ইতিপূর্বে মাদ্রাসার বিরোধিতা প্রসঙ্গে কতক ব্যবসায়ীর উক্তি গিয়েছিল, যা বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় আলেমদের লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছিলেন; বরং কোন প্রকার অত্যুক্তি ছাড়া বলছি যে, স্বয়ং আমিও সতাধিক ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে, হুজুর! এর পূর্বে তো আমরা আপনাদের থেকে বিমুখ ও বিচ্ছিন্ন ছিলাম; এ তাবলীগের উসীলায় আপনাদের কাছে ভীড়েছি।

আচ্ছা এ কথা কি অস্বীকার করার কোন উপায় আছে যে, তাবলীগ জামাতের পূর্বে হক্কানী ওলামা কেরামের শুধু আগমনই কত কঠিন ছিল। ওয়াজ নসীহত করা তো বহু পরের কথা। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর স্ত্রী যখন হজ্জ থেকে ফিরলেন এবং তাকে এগিয়ে আনতে হযরতকে বোম্বাই শহরে যেতে হল, তখন তিনি কি পরিমাণ কষ্ট যে পেয়ে ছিলেন, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। সন্ত্রাসীরা বিদ্যুৎ লাইন কেটে দিয়ে সে ঘর ঘেরাও করে ফেলল এবং হযরতের উপর আক্রমণ করল। পরিশেষে তাঁকে অত্যন্ত কৌশলে রাতের অন্ধকারে অন্য ঘরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

১৩৩৮ হিজরী সালে হযরত সাহারানপুরী (রহঃ) তিনশত খাদেম সাথে নিয়ে যখন হজ্জে রওনা হলেন। এ অধমও সাথে ছিল। সে সময় বোম্বাই শহরের মস্তানদের ভয়ে হযরতকে পুরা কাফেলাসহ শহর থেকে দশ মাইল দূরে এক কবরস্তানে তাবু টানিয়ে অবস্থান করতে হয়েছিল। বোম্বাই শহরে দেবন্দী ওলামা কেরামের প্রকাশ্যে গমন কতখানি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তা কারই অজানা নেই। বোম্বাই শহরের কোন মসজিদে প্রসিদ্ধ কোন দেওবন্দী নামায পড়লে সে মসজিদ পাক করা হত। অথচ এখন লক্ষ্য করুন, সেই বোম্বাই শহরেই হক্কানী ওলামা কেরামের চাহিদা এত বেশী যে, সে চাহিদা পূরণ করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাহোক, এ কথা অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই যে, তাবলীগের মরুব্বীরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। এরপরও যদি কোন আনাড়ীকে এ ধরনের কোন অসদাচরণ করতে দেখা যায় তবে দেখতে হবে; এর তাবলীগে আসার পূর্বে ওলামাদের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল। যদি এমন হয় যে, তাবলীগে আসার পূর্বে তার সম্পর্ক ভাল ছিল, তাবলীগে আসার পর সে ওলামা-বিদ্বেষী হয়েছে তবে তো নিঃসন্দেহে এ অভিযোগ যথাযথ। আর যদি এমন হয় যে, আগে থেকেই সে ওলামা-বিদ্বেশী ছিল তাহলে আপনিই বলুন; এ দায়িত্ব কি গোটা জামাতের উপর বর্তায়, না সেই ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী?

এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর সুন্দর একটি কথা মনে পড়ল। একবার কোন এক মাদ্রাসার ছাত্র চুরি করল। মালিক হযরতের কাছে অভিযোগ করল যে, তালেবুল ইলমও চুরি করা ধরেছে। জবাবে হযরত বললেন, না; বরং চোর তালেবুল ইলম সেজেছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর কয়েকটি বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

এরশাদ– ১

আমাদের জামাতের সাথীরা যেখানেই যাবে, তারা যেন সেখানকার হক্কানী আলিম ও নেককারদের সাথে সাক্ষাত করে। আর এ সাক্ষাত হবে তাঁদের থেকে কিছু হাসিল করার উদ্দেশ্যে। সরাসরি তাঁদেরকে এ কাজের দাওয়াত দিবে না। কেননা, তাঁরা দ্বীনের যেসব খিদমতে ব্যস্ত আছেন সে বিষয়ে তারা ভালভাবেই অবগত এবং এর উপকারিতা সম্পর্কেও তাঁরা বেশ অভিজ্ঞ। সুতরাং তোমরা তোমাদের বিষয় তাঁদের ভালভাবে বুঝাতে পারবে না যে, তোমাদের এ কাজ অন্যান্য সকল ধর্মীয় ব্যস্ততা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ। ফলে তাঁরা তোমাদের কথা মানবে না। তাই তাঁদের খেদমতে শুধু ফায়দা হাসিল করার উদ্দেশ্যে যেতে হবে। তবে তাঁদের আশে-পাশে জোরদার হেমনত করতে হবে এবং যত বেশী সম্ভব উসূলের পাবন্দী করতে হবে। এভাবে আমল করলে আশা করা যায় তোমাদের এ কাজের ফলাফল তাঁদের কানে এমনিতেই পৌঁছে যাবে এবং তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সহায়ক হবে। তারপর যদি তাঁরা নিজেরা তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন তাদের

খেদমতে দায়িত্বভার গ্রহণের এবং নেতৃত্বদানের দরখাস্ত করবে। তাঁদের আদব ও এহতেরাম পূর্ণভাবে বজায় রেখে তাদের সাথে নিজের কথা বলতে হবে। (মলফুযাত)

ইরশাদ– ২

যদি কোন জায়গায় গিয়ে সেখানকার ওলামা কেরাম ও নেককারদের এ কাজের প্রতি অসহানুভূতিশীলতা পরিলক্ষিত হয় তবে তাঁদের প্রতি বদগুমান হওয়া যাবে না; বরং এ কথা ভাবতে হবে যে, তাঁদের সামনে এখনও এ কাজের পূর্ণ হাকীকত পরিষ্কার হয়নি। তাছাড়া মানুষ যখন এ তুচ্ছ দুনিয়ার ব্যস্ততা ছেড়ে আসতে পারছে না, তাহলে আহলে ইলম তাঁদের দ্বীনী এ গুরুদায়িত্ব ছেড়ে কি করে চলে আসবেন।

ইরশাদ– ৩

মুসলমানদের ওলামা কেরামের খেদমতে চারটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাওয়া উচিত। (১) মুসলমান ভাই হিসেবে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। (২) তাঁদের অন্তর ও দেহ ইলমে নববীর ধারক ও বাহক, এই হিসেবেও এঁরা শ্রদ্ধার পাত্র, খেদমত পাওয়ার যোগ্য। (৩) এঁরা আমাদের ধর্মীয় যাবতীয় বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক। (৪) তাঁদের যাবতীয় প্রয়োজনাদির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য। কেননা অন্যান্য মুসলমানরা যদি তাঁদের পার্থিব প্রয়োজনাদির খোঁজ নিয়ে তা পূরণ করার চেষ্টা করে, বিশেষতঃ বিত্তশালীরা তা করতে পারে, তাহলে এঁরা এদিক থেকে নিশ্চিত হয়ে সম্পূর্ণ সময়টুকু দ্বীনের খেদমতে ব্যয় করতে পারেন। এতে বিত্তশালীরাও তাঁদের যাবতীয় আমলের ছওয়াবের অংশীদার হবে। (মলফুযাত)

ইরশাদ– ৪

একবার ইরশাদ করেন, সাহারানপূর এবং দেওবন্দে যেসব জামাত পাঠানো হচ্ছে তাদের সাথে দিল্লীর ব্যবসায়ীদের পত্রগুলো পাঠিয়ে দেয়া হোক। আর তাতে অত্যন্ত বিনীত স্বরে ওলামা কেরামের খেদমতে আরজ করা হোক যে, এই জামাতগুলো সাধারণ লোকদের মাঝে তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে আসছে। আপনাদের সময় তো নিঃসন্দেহে অনেক মূল্যবান; তবুও যদি আপনাদের এবং

ছাত্রদের কোন ক্ষতি না হয় তাহলে কিছু সময় বের করে এই কাফেলাগুলোর তত্ত্বাবধানের অনুরোধ রইল। ছাত্রদেরকে আপনাদের সাথে এবং আপনাদের তত্ত্বাবধানে জামাতে নিয়ে যাবেন। তাদের জন্য কোন উস্তাদের তত্ত্বাবধান ছাড়া একা জামাতে যাওয়া উচিত নয়।

আর জামাতের সাথীদের ভালভাবে নসীহত করে দেয়া হোক যে, যদি ওলামা কেরামের পক্ষ থেকে এ কাজের প্রতি শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়, তবে যেন তাঁদের প্রতি মনে কোন প্রকার বিরূপ ভাব সৃষ্টি না হয়; বরং মনে করতে হবে যে, তাঁরা আমাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন এই ইলমে দ্বীনের খেদমতের জন্য তাঁদের সারা রাত জাগ্রত থাকতে হয়। অথচ অন্যরা তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। আর ওলামা কেরামের অমনোযোগের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করবে। কেননা আমরা তাঁদের কাছে যাতায়াত কম করেছি। সুতরাং যারা তাঁদের খেদমতে বছরকে বছর পড়ে আছে স্বভাবতই তারা ওলামা কেরামের অধিক মোনযোগ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

আরও ইরশাদ করেন, সাধারণ মুসলমানের ব্যাপারেই অনর্থ বদগুমান হওয়া নিষেধ রয়েছে। সুতরাং ওলামা কেরামের ব্যাপারে বদগুমান হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।

হযরত মাওঃ দেহলুভী (রহঃ) আরও বলেন, আমাদের এই তাবলীগের কাজে সাধারণ মুসলমানের ইজ্জত করা আর ওলামা কেরামের সম্মান করা বুনিয়াদি বিষয়। সকল মুসলমানকে ইসলামের সুবাদে ইজ্জত করতে হবে। আর ওলামা কেরামকে ইলমে দ্বীনের সুবাদে অনেক সম্মান করবে। তার পর ইরশাদ করেন, ইলম ও যিকির এখন পর্যন্ত আমাদের মুবাল্লিগদের আয়োত্তে আসেনি। যার কারণে আমি অত্যন্ত চিন্তিত। এর একমাত্র সমাধান হল, এদেরকে ওলামা কেরাম ও পীর-মাশায়েখদের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। তাদের খেদমতে থেকে তাবলীগও করবে এবং তাদের ইলম ও সুহবত থেকে উপকৃতও হবে। (মলফুযাত)

ইরশাদ– ৫

একবার হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উছমানীকে লক্ষ্য করে বলেন, হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত লোকদের আমি বেশ কদর

করি। কেননা এরা নিকটবর্তী যুগের। এ জন্যই তোমরা সহজেই আমার কথা বুঝতে পার। তোমরা মাওলানার কথা সদ্য শুনে এসেছো। তোমাদের দ্বারা আমার এ কাজে অনেক বরকত হচ্ছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তারপর তিনি মাওলানাকে অনেক দোয়া দিয়ে বললেন, তুমি নিজেও চোখের পানি ঝরিয়ে এ নেয়ামতের শোকর আদায় কর। (মালফুযাত)

ইরশাদ– ৬

আমাদের এ জামাতগুলোকে তিন ধরনের লোকদের কাছে তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষভাবে যাওয়া উচিত। ওলামা ও নেক্কারদের খেদমতে দ্বীন শিক্ষা করা এবং দ্বীনের উত্তম আছর গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। (মালফুযাত)

ইরশাদ– ৭

আমাদের এ কাজের উসূল হল, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমানদের হক আদায় করে তাদের সামনে এ দাওয়াত পেশ করা। ওলামা কেরামের খেদমতে যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সাথে এ দাওয়াত পেশ করতে হবে।

ইরশাদ– ৮

ওলামা কেরামের কাছে এ আরয করতে হবে যে, তাবলীগী জামাআতগুলোর এ নকল-হরকত ও চেষ্টা-সাধনা সাধারণ লোকের মাঝে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ জন্মাতে পারে। এরপর এদের তালীম ও তারবিয়াতের দায়িত্ব ওলামা ও নেক্কারদের নেকদৃষ্টির মাধ্যমেই আঞ্জাম পেতে পারে। তাই আপনাদের নেকদৃষ্টির তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। (মালফুযাত)

ইরশাদ– ৯

কোন এক প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত আলিম ও লিখকের আলোচনা হল। যিনি নিজের কতক ইলমী দুর্বলতার কারণে বিশেষ দ্বীনদার মহলে বেশ সমালোচিত। কিন্তু হযরত মাওলানা বললেন, আমি তো তাঁর বেশ কদর করি। তাঁর কোন দুর্বলতা থেকে থাকলেও আমি তা জানতে চাই না। এটা আল্লাহর ব্যাপার। হতে পারে তাঁর কাছে কোন ওজর রয়েছে। আমাদের তো এই দু'আ করতে বলা হয়েছে;

و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا

এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না।[৫৯ঃ১০]

ইরশাদ– ১০

আমাদের এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো, মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত গোটা দ্বীন শিক্ষা দেয়া। অর্থাৎ ইসলামের ইলমী ও আমলী পূর্ণ নেযামের সাথে এ উম্মতকে জুড়ে দেয়া। এই তো হল আমাদের মূল লক্ষ্য। তবে এই জামাতগুলোর নকল, হরকত ও গাস্ত মূল লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক উপায়মাত্র। আর কালিমা ও নামাযের তালকীন ও তালীম আমাদের পুরো নেছাবের আলিফ, বা, তা মাত্র। আর এ কথা সর্বজন বিদীত যে, আমাদের এ জামাতগুলোর পক্ষে পূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। তারা শুধু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সর্ব সামর্থ্য ব্যয়ের মাধ্যমে সবার মধ্যে চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে পারে। আর উদাসীনদের সচেতন করে তুলে স্থানীয় আলিম সম্প্রদায়ের সাথে জুড়ে দিয়ে আলিম ও নেক্কারদের এদের ইছলাহের জন্য নিয়োজিত করার চেষ্টা করতে পারে। সব জায়গার মূলকাজ তো স্থানীয় কর্মীদের মাধ্যমেই হতে পারে। সাধারণ লোকদের পক্ষে স্থানীয় লোকদের থেকেই অধিক উপকৃত হওয়া সম্ভব। অবশ্য এসব পদ্ধতি শিখতে হবে আমাদের লোকদের কাছে, যাঁরা রীতিমত শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত ও অভিজ্ঞ। (মালফুযাত)

ইরশাদ– ১১

এক চিঠিতে তিনি লিখেন, ইলমের উজ্জ্বলতা ও উন্নতী যতখানি বৃদ্ধি পাবে দ্বীনের উজ্জ্বলতা ও উন্নতী ততখানিই বৃদ্ধি পাবে। আমার এ আন্দোলনের কারণে ইলমের সামান্যতম আঁচড় আসবে এটা আমার জন্য বিরাট বিপর্যয়ের কারণ। ইলমের দিকে যারা উন্নতী লাভ করছেন তাঁদের গতিপথে সামান্যতম বাধা প্রদান আমার এ তাবলীগের উদ্দেশ্য নয়; বরং এই ইলমের আরও উন্নতী হওয়া প্রয়োজন; যতটুকু হয়েছে এতটুকু মোটেই যথেষ্ট নয়। (সাওয়ানেহে হযরত দেহলুভী)

হযরত দেহলুভীর জীবন চরিতে মাওলানা আলী মিয়া লিখেন যে, হযরত

মাওলানা এই দাওয়াতের মাধ্যমে এক দিকে ওলামা কেরামকে আহবান করতেন, তাঁরা যেন পূর্ণ দরদ ও ব্যথা নিয়ে সাধারণ লোকদের পাশে এসে দাঁড়ান। অন্য দিকে সাধারণকে শিক্ষা দিতেন, তারা যেন ওলামা কেরামের মর্যাদা বুঝে তাঁদের পূর্ণ কদর করে তাঁদের কাছ থেকে কিছু আহরণ করে এবং ওলামা কেরামের খেদমতে হাযির হওয়ার ফযীলত বর্ণনা করে তাঁদের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য জোর তাগিদ করতেন। সেই সাথে তাঁদের খেদমতে হাজির হওয়ার আদব ও উসূল বাতলে দিতেন। তাঁদেরকে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি এবং তাঁদেরকে ব্যস্ত করার নিয়ম শিখিয়ে দিতেন এবং ওলামা কেরামের কোন বিষয় বোধগম্য না হলে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করা এবং তাঁদের প্রতি সুধারণা রাখার অভ্যাস করাতেন। তাদেরকে ওলামা কেরামের খেদমতে পাঠাতেন। ফিরে আসার পর জিজ্ঞাসা করতেন কিভাবে গিয়েছিলে এবং কি কি আলোচনা হয়েছে। কেউ ওলামা কেরামের সমালোচনা করলে কিংবা তাদের প্রতি কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে তার ইসলাহ করতেন। এভাবেই সাধারণ ব্যবসায়ী ও বিত্তশালীদেরকে ওলামাদের এত নিকটতর করে দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি।

দুর্ভাগ্য বশতঃ শহরের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং স্থানীয় কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে ওলামা ও সাধারণের মাঝে যে বিরূপ ভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল হযরত মাওলানার অসাধারণ মেহনত ও কৌশলের বদৌলতে অন্তত এই দাওয়াতের গণ্ডি সীমায় এই মনমানসিকতা জন্মে গিয়েছে যে, তারা দ্বীনের খাতিরে রাজনৈতিক মতানৈক্যকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে এবং রাজনৈতিক শত মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও হক্কানী ওলামা কেরামের শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছে। বড় বড় ব্যবসায়ী যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ ওলামা কেরামদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল তারা এখন ওলামা কেরামের খেদমতে অত্যন্ত আদবের সাথে উপস্থিত হতে আরম্ভ করেছে এবং তাঁদেরকেও নিজেদের বিভিন্ন মজলিসে এবং মাজমাআয় নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। (সাওয়ানেহে হযরত দেহলুভী)

ইরশাদ– ১২

একবার তাঁর অসুস্থতার সময় কয়েকজন তাঁকে ওযু করাইতেছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে দীর্ঘ নসীহত করেন। তাতে তিনি তাদের বলেন, তোমরা

যে আমাকে ওযু করাচ্ছো এতে অসুস্থের খেদমতের পাশাপাশি এ নিয়তও করবে, আয় আল্লাহ! আমাদের ধারণায় তোমার এ বান্দার নামায আমাদের চেয়ে উত্তম, সুতরাং আমরা তাকে ওযু করাচ্ছি এই আসায়, যাতে তার নামাযের কিছু অংশ আমরাও পেতে পারি। তারপর বলেন, এটাত হল তোমাদের করণীয়। কিন্তু আমি যদি ভাবি যে, আমার নামায এদের থেকে উত্তম হয়, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।

তারপর অন্যান্য আলোচনার পর বলেন, তোমরা ঐসব ওলামা কেরামের খেদমত কর যাঁরা এখনও তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করেননি। আমি তো তোমাদের সাথে আছিই। আমাকে না ডাকলেও তোমাদের কাছে যাবো। যেসব ওলামা কেরাম তোমাদের প্রতি এখনও দৃষ্টিপাত করেননি তাঁদের খেদমত কর; তাহলে তাঁরাও তোমাদের খেদমত করতে আরম্ভ করবেন।

ইরশাদ– ১৩

হযরত মাওলানা ইয়ূসুফ (রহঃ) ওলামা কেরামের বেশ কদর করতেন। অধুনা ওলামা কেরামের যে না-কদরী হচ্ছে এবং অনর্থ তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হচ্ছে এটা তিনি দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। যারা এ ধরনের আচরণ করে তাঁদের জন্য রহমত থেকে বঞ্চিতির কারণ মনে করতেন।

একবার তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লক্ষ্য করে লিখেন, মনে রাখতে হবে আমরা শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরামের কাছে সর্বদা মুহতাজ। এঁদের ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। এঁদের সাথে জড়িত থাকা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁরা হলেন অসংখ্য গুণের অধিকারী এবং ইলমে নববীর নূরের ধারক ও বাহক। এঁদের কদর করা প্রকৃত প্রস্তাবে ইলমে নববীর কদর করা। আমরা যে পরিমাণ তাঁদের কদর করব, তাঁদের খেদমত করব, তাঁদের কাছে যাওয়াকে বড় ইবাদত মনে করে তাঁদের উপদেশবাণী শুনব, তাঁদের থেকে সৎ পরামর্শ নিব; সে পরিমাণই ইলমে নববীর নূর দ্বারা নুরান্বিত হতে সক্ষম হব।

ইরশাদ– ১৪

একবার এক তা'লীমের হালকার শেষে ওলামা কেরামকে লক্ষ করে বলেন,

আমাদের এটা কাম্য নয় যে, বুখারী শরীফের উস্তাদদের টেনে এনে আত্তাহিয়্যাতু শিখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করব। কিন্তু এতটুকু অবশ্যই আমাদের কাম্য যে, এদের মনেও যেন আত্তাহিয়্যাতু পড়ানোর গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। কেননা এটাও ইলমে নববীর অংশ, এটাকে অগুরুত্ব দিলে আমাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আর এটাও আমাদের কাম্য যে, এ স্তরের তালীমও বুখারীর উস্তাদদের তত্ত্বাবধানেই হোক। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

ইরশাদ– ১৫

একবার জনৈক আলিমের নামে লিখা এক চিঠিতে লিখেন, আল্লাহ পাক আপনাকে গুণ সমৃদ্ধ ও নুরাণী ও রুহানী ইলমের অথৈ সমুদ্র বানিয়েছেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান এই আমানতের দায়ী' হিসেবে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আপনি যদি একটু নেক দৃষ্টি দান করেন এবং দু'আ করেন তাহলে হয়ত দ্বীনের এ মুবারক জামাত ইলমের চূড়া থেকে এই মুবারক আমলের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং নিজেদের ইলমী কুরবানীর পাশাপাশি কিছু দিন এই ঘাটিকেও অতিক্রম করবেন। তাহলে এই পবিত্র আমানত যোগ্য লোকের হাতে এসে সজীব হয়ে উঠবে এবং অযোগ্যদের হাতে পড়ে যেসব ক্ষতির শিকার হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

ইরশাদ– ১৬

হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) তার এক চিঠিতে লিখেন, বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি বদগুমান করবে না; বরং তাদের খেদমতে শুধু ফায়দা হাসিল করার উদ্দেশ্যে যাবে। তাদের কাছে যাওয়ার সময় মনে এ ধরনের ধারণা যেন স্থান না পায় যে, তাদের কিছু দিতে যাচ্ছি; বরং তাদের কাছ থেকে কিছু হাসিল করার নিয়তই মনে রাখবে। তাদেরকে দাওয়াত দিবে না। (সাওয়ানেহে ইউসুফী আযীযী)

ইরশাদ– ১৭

হযরত মাওলানা ইয়ূসুফ (রহঃ) বিদায়ী হিদায়েতের সময় বলতেন, খুসূসী গাস্তে দ্বীনের লাইনে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতকালে শুধু তাঁর কাছে দু'আ চাইবে। তাঁর আগ্রহ পরিলক্ষিত হলে কিছু কারগুজারী শুনিয়ে দিবে। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

মুফতী আযীযুর রহমান বিজপুরী সাহেব যখন প্রথম তাবলীগ জামাতে আগমন করেন হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব তাঁর প্রতি বর্ণনাতীত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর বেশ কদর করেন। মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব সে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন, হযরত মাওলানার এ ব্যবহার শুধু আমার সাথেই নয়; বরং যে কোন লোক সম্পর্কে আলেম বলে পরিচয় পেলেই হত তাঁর সাথেই এ ধরনের ভাল ব্যবহার করতেন। আমার সাথে আমার এক বন্ধু ছিল যাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলেম বলে মনে হত না। আমি কথা প্রসঙ্গে তাঁকে মাওলানা বলে সম্বোধন করতেই হযরত তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাঁকে ডেকে এনে কাছে বসতে দেন।

হযরতজী বলতেন, আমি দেওবন্দ ও সাহারানপুর যেসব জামাত প্রেরণ করি, এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, এরা গিয়ে তাঁদেরকে দাওয়াত দিবে; বরং এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকি যে, বর্তমান সমাজে ওলামা কেরাম ও সাধারণের মাঝে যে দুরুত্ব বিরাজ করছে এর কিছুটা নিরসন হোক এবং পরস্পরের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পাক। আর এতেই রয়েছে সকলের জন্য মঙ্গল নিহিত।

ইরশাদ– ১৮

হযরত মাওলানা ইয়ুসুফ (রহঃ)-এর সিলেট সফরের কারগুজারী বর্ণনা করার পর মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব লিখেন, সিলেট হল হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী '(রহঃ)-এর ভক্ত ও অনুরক্তদের এলাকা। হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এ ধরনের সম্পর্কের প্রতি বেশ লক্ষ্য রাখতেন। যেসব এলাকা কোন বিশেষ বুযুর্গের সাথে সম্পর্কিত সেখানে প্রয়োজন না থাকলেও ইজতেমা ধার্য করতেন। আম্বাহাট্টার ইজতিমা হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর কারণেই স্থির হয়েছিল।

যাহোক, সিলেটের এজতেমায় হজরত মাদানী (রহঃ)-এর বহু খোলাফা কেরাম অংশ গ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা এঁদের বেশ কদর করেন এবং মাশওয়ারায়ও তাঁদেরকে শামিল করেন। তাঁদের পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে এ কাজের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইরশাদ– ১৯

মাওলানা মুহাম্মদ ছানী সাহেব রচিত 'সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী'-তে রয়েছে, হযরত মাওলানা ইয়ূসুফ সাহেব (রহঃ) আল-হাজ্জ মাওলানা ফযলে আলীম সাহেব মুরাদাবাদী মাক্কীর নামে লিখা এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেন, মানব জীবনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইলম ও যিকিরের ব্যস্ততা। আর এর জন্য নিয়মিত দু'টি গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

[এক] আহলে ইলম ও আহলে যিকিরের আযমত ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা। নিজেদের যাবতীয় বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং তাঁদের যাবতীয় হক আদায় করা। অনুরূপভাবে পার্থিব বিষয়ে দুনিয়ার লাইনে যাঁরা বড় তাদের হক আদায় করা এবং নিজেদের পার্থিব যাবতীয় কাজে তাঁদের পরামর্শও গ্রহণ করা।

ইরশাদ– ২০

দীর্ঘ ২৩ পৃষ্ঠার সারগর্ভ ও নসীহতপূর্ণ আর এক চিঠিতে ইলমের ফাযায়েল সম্পর্কে আলোচনা করার পর লিখেন, "ওলামা কেরামের খেদমতে হাযির হতে হবে এবং এটাকেও ইবাদত মনে করতে হবে। (সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী)

মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর এক খাদেম তাঁর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একদিন আমরা কতক সাথী আবু দাউদ শরীফের সবক পড়ার জন্য হযরতজী (মাওলানা ইয়ূসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কুতুবখানায় যাচ্ছিলাম– এমন সময় হযরত থানুভী (রহঃ)-এর খলীফা হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব জালালাবাদীর আগমনের সংবাদ এল। তাই সেদিন আমাদের সবক আর হল না। হযরতজী তার কামরা থেকে বের হয়ে মাওলানার এস্তেকবাল করলেন এবং সেই কামরায়ই বসে গেলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর হযরতজী নিজের কুতুবখানা থেকে তাঁর রচিত 'আমানিল আহবার' ও 'হায়াতে সাহাবা' এনে মাওলানার হাতে দিলেন। মাওলানা একেক পৃষ্ঠা দেখছিলেন আর হযরতের প্রতীভার প্রশংসা করছিলেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

সমালোচনা– ৬

তাবলীগ জাহেলদের কাজ নয়

আরেকটি প্রশ্ন হল, তাবলীগ তো ওলামা কেরামের কাজ; জাহেলরা তা নিয়া মাথা ঘামাবে কেন? এ প্রশ্নটিও বেশ অনেক দিন ধরেই চলে আসছে এবং আমার কাছেও এ যাবৎ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে এ প্রশ্ন এসেছে। আমিও প্রয়োজন সাপেক্ষে কখনও বিস্তারিত কখনও সংক্ষেপে জবাব দিয়ে এসেছি।

বস্তুত তাবলীগ আর ওয়ায দু'টি ভিন্ন জিনিস। এ দু'টি জিনিসের মাঝে পার্থক্য না জানাই এ প্রশ্নের মূল উৎস। ওয়ায হল, কোরআন ও হাদীসের আলোকে স্বীয় আলোচনা পরিবেশন করা। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটি একটু ঝুঁকি সাপেক্ষ; এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ওয়ায করার জন্য আলিম হওয়া আবশ্যক, যাতে কুরআন হাদীসের পরিপন্থী কোন তথ্য পরিবেশিত না হয়।

অপর পক্ষে তাবলীগ হল, কোন বিষয় অন্যের কাছে পৌছে দেয়ামাত্র। আর শুধু এইটুকুর জন্য সে বিষয় সম্পর্কে ইলম থাকা আবশ্যক নয়।

আকাবিরদের মধ্যে যাঁরা তাবলীগের জন্য আলিম হওয়ার শর্তারোপ করেছেন তাঁরা তাবলীগের সাধারণ অর্থ নিয়েছেন। অন্যথায় বর্তমান প্রচলিত তাবলীগের উপর এ প্রশ্ন অর্থহীন। কেননা এতে শুধু সীমিত ছয়টি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয় এবং এ ছয়টি বিষয়ের মশক করানো হয় এবং এ পয়গাম নিয়েই দেশ-বিদেশ সফর করানো হয়। আর তাদের ছয় উসূল তথা ছয়টি মৌলিক ধারার সাথে আরেকটি ধারা হল, এ ছয়টি বিষয়ের বাইরে যেন আলোচনা না হয়।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ) ইরশাদ করেছেন, শরীয়তের দ্ব্যর্থহীন ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদিতে তাবলীগের জন্য আলেম হওয়া শর্ত নয়; বরং যে কোন ব্যক্তি জোর গলায় এর প্রচার প্রসার করতে পারে। অবশ্য ইজতিহাদী বিষয়ে আলোচনা করা শুধুমাত্র আলেমদের কাজ। সাধারণ মানুষ এসব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে নিঃসন্দেহে ভুল হয়ে যাবে। (আনফাসে ঈসা)

মজার ব্যাপার এই যে, একদিকে তাবলীগের লোকদের উপর এ প্রশ্ন করা

হয় যে, তাবলীগ তো জাহেলদের কাজ নয়। জাহেলরা কেন তাবলীগ করতে আসে। অন্য দিকে তাদের উপর এ প্রশ্ন করা হয় যে, এরা মাত্র ছয়টি বিষয়েই ব্যস্ত থাকে; এর বাইরে যেতেই চায় না। অথচ শরীয়তের আরো অনেক বিষয় রয়েছে। এর জবাবও আমরা এই দিয়ে থাকি যে, তাবলীগী জামাতে সাধারণতঃ নিরক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়ে থাকে, যাদের জন্য সীমিত আলোচনার বাইরে যাওয়ার মোটেই অনুমতি নেই। অবশ্য জামাতে কোন আলেম থাকলে তার কথা ভিন্ন। কিন্তু আলেমদের জন্যও জামাতে বের হয়ে এবং জামাতের এজতেমাতে ছয় নম্বরের বাইরে আলোচনা করার অনুমতি নেই। কেননা, অন্যান্য বিষয়গুলো সাধারণতঃ বিতর্কিত হয়ে থাকে। আর বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা ঝগড়া সৃষ্টি করে। অপর পক্ষে এ ছয়টি বিষয়ে যেহেতু কারো দিমত নেই সুতরাং এতে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কোন অবকাশও নেই।

হাদীছ শরীফে এবং সাহাবা কেরামদের বক্তব্যে এর বহু প্রমাণ রয়েছে যে, শুধু তাগলীগ করার জন্য আলেম হওয়া শর্ত নয়। যেমন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী হজ্জের সময় বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা করেছিলেন, যা হাদীছ গ্রন্থগুলোতে সুপ্রসিদ্ধ যে, "উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদেরকে আমার এ বাণী পৌছে দেয়।" অথচ তখন তার সামনে সোয়া লক্ষ লোক ছিল। যার মধ্যে নিশ্চয়ই সকলে আলেম ছিলেন না; বরং অনেকে তো এমনও ছিলেন যারা জীবনে এই প্রথম নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু বিশেষ পয়গাম পৌছানোর ব্যাপার ছিল, তাই এর জন্য আলেম হওয়া শর্ত ছিল না। এজন্যই নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাধারণভাবে) বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা দিলেন "উপস্থিতরা যেন আমার এ বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দেয়।"

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে একটি শিরনামা নির্ধারণ করেছেন– رب مبلغ اوعى من سامع "অর্থাৎ "অনেক স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞানের অধিকারীর কাছে বার্তা পৌছে থাকে।"

এই শিরোনামার অধিনে তিনি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীছ উল্লেখ করেছেন যে, "তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু সব সময়ের জন্য তেমনই হারাম যেমন হারাম এই শহরে, এই

দিনে এবং এই মাসে। তারপর ঘোষণা করলেন, তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌছে দিবে। অসম্ভব কিছুই নয় যে, উপস্থিতরা এমন লোকের কাছে পৌছে দিবে যে এদের চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী হবে।

এ হাদীছ দ্বারা এ সংশয়েরও নিরাসন হয়ে গেল যে, ওলামা কেরামের কাছে দাওয়াত পৌছানোর জন্য জাহেলদের পাঠিয়ে দেয়া হয় কি করে?

হযরত দেহলুভী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে তাবলীগের যোগ্য মনে না করে, তার জন্য নিছক এ অজুহাতে বসে থাকা উচিত নয়; বরং তার আরও জোরদার মেহনত করা উচিত। অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অযোগ্যদের মাধ্যমে শুরু হয়ে যোগ্যদের হাত পর্যন্ত পৌছে যায়। আর তখন তার প্রকৃত উন্নতী হাসিল হয়। আর এর পূর্ণ ছওয়াব অযোগ্যরাও লাভ করে। কেননা, হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

من دعا إلى حسنة – الحديث

সুতরাং অযোগ্যদের কোমর বেঁধে মেহনত করা উচিত।

আমি নিজেও নিজেকে অযোগ্য মনে করি বলেই এ কাজে লেগে আছি। হতে পারে এক পর্যায় গিয়ে কোন যোগ্য লোকের হাতে গিয়ে এ কাজের আসলরূপ প্রকাশ পাবে। আর তখন তার ছওয়াব আমিও পাব। (মালফুযাত হযরত দেহলুভী)

ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি শিরোনামা নির্ধারিত করেছেন–

باب تحريض النبى صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الإيا و العلم و يخبروا من ورائهم

অর্থাৎ– নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু কায়েসের প্রতিনিধী দলকে কিছু কথা বলার পর বললেন, এগুলো মুখস্থ করে নাও এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে দিবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) باب القراءة على المحدث (মুহাদ্দেছের সামনে হাদীছ পাঠ করা) এ অধ্যায়ে এক বেদুঈন সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি

এসে আরজ করলেন, আমাদের কাছে আপনার দূত এসে আপনার পক্ষ থেকে এ বার্তা শুনিয়েছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার দূত সত্য বলেছে। তিনি আরজ করলেন, আপনার দূত এও বলেছেন যে, আমাদের উপর নাকি পাঁচ বেলা নামায ফরয করা হয়েছে। ইরশাদ করলেন, আমার দূত সত্য বলেছে। সাহাবী আরয করলেন, তিনি এও বলেছেন যে, আমাদের উপর নাকি এক মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে সত্য বলেছে। সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন! আমি এ জিনিসগুলোর মধ্যে কমও করব না বেশীও করব না। নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আলোচ্য হাদীছে কম-বেশী না করার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এও হতে পারে যে, আমি আমার কওমকে পৌঁছাতে কোন প্রকার কমবেশী করব না।

'আনফাসে ঈসা' গ্রন্থে হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তাবলীগ দু' ধরনের। 'খাস' ও 'আম' (বিশেষ ও সাধারণ)। তাবলীগে 'খাস' অর্থাৎ বিশেষ বিষয়ের তাবলীগ, এটি পৃথক পৃথকভাবে সকলের দায়িত্ব। আর তাবলীগে 'আম' অর্থাৎ সাধারণ বিষয়ের তাবলীগ। এর জন্য আলিম হওয়া আবশ্যক।

অনুরূপভাবে 'গায়রে মানসূস্' (যেসব বিষয়ে কোরআন হাদীছে প্রত্যক্ষ কোন নির্দেশ নেই) সেসব বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আলেম হওয়া আবশ্যক। 'মানসূস' (কোরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণিত বিষয়াদি) সম্পর্কে আলোচনা করতে আলেম হওয়া আবশ্যক নয়; যে কোন মুসলমানই এ কাজ করতে পারে।

গোড়া থেকে আমি এ পার্থক্যটুকুই বুঝাতে চেষ্টা করে এসেছি যে, ওয়াজ করার জন্য আলেম হওয়া শর্ত কিন্তু বিশেষ কোন বিষয় পৌঁছে দেয়ার জন্য

আলেম হওয়া শর্ত নয়; বরং যে কোন ব্যক্তিই তা করতে পারে এবং প্রত্যেকের জন্য করা আবশ্যক।

হযরত থানুভী (রহঃ) তাবলীগের আদবসমূহ শিরোনামে তার এক ওয়াজে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাতেও তিনি তাবলীগে 'খাস' আর তাবলীগে 'আম'-এর মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, তাবলীগে খাসের জন্য মাসআলার হাকীকত সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল হওয়া এবং তা বর্ণনা করার সামর্থ্য থাকা পূর্ব শর্ত। আর তাবলীগে আম অর্থাৎ ওয়াজ করা এটা ওলামা কেরামের কাজ; চাই প্রচলিত নিয়মে মাদ্রাসায় পড়ে আলেম হোক কিংবা কোন আলেমের কাছে মাসআলা জেনে জেনে আলেম হোক। তবে শর্ত হল কোন বড় আলিম কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। যেমন, সাহাবা কেরামও তো কোন মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন নাই। তারাও তো শুনে শুনেই তাবলীগ করতেন। তাই বলে কোন আলেমের স্বীকৃতি ছাড়া যে কেউ নিজেকে এর যোগ্য মনে করবে না।

হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানুভী (রহঃ)-এর নির্দেশে হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উছমানী কর্তৃক অনুদিত বুহ্জাতুন্ নুফুসে (এ গ্রন্থটি বুখারী শরীফ থেকে সংগৃহীত হাদীছের সংকলন) লিখা রয়েছে যে, তাবলীগের কাজে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। কেননা, আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার দ্বারা তাবলীগই উদ্দেশ্য।

সত্যি পরিতাপের বিষয় নয় কি, এক দিকে ওলামা কেরাম শুধু দরস-তাদরীস (পঠন-পাঠন)-কেই যথেষ্ট মনে করছেন, অন্য দিকে সাধারণ মানুষকেও আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন অথচ এরা যেই আম্বিয়া কেরামের ওয়ারিছ, তাঁদের মূল দায়িত্ব 'আমর-নেহী ও তাবলীগই ছিল। পারিভাষিক দরস-তাদরীস তাদের দায়িত্ব ছিল না। দরস ও তাদরীস মূল লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় ও উপকরণ মাত্র, যাতে মুবাল্লেগ সহী ইলমের সাথে নির্ভুল তাবলীগ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় নয়কি যে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে উপায় ও মাধ্যম নিয়েই শুধু ব্যস্ত।

সাধারণ মুসলমানের জেনে রাখা উচিত যে, শরীয়তের আহকামের তাবলীগ করা শুধু আলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানের

উপর ফরয হল, আহকাম সংক্রান্ত যতটুকু ইলম অর্জিত হয়েছে ততটুকু অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া। যেমন, নামায যে ফরয এ কথা কারোই অজানা নেই। সুতরাং বে-নামাযীকে নামাজের জন্য সতর্ক করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। অনুরূপভাবে যেসব বিষয় গুনাহ বলে যার জানা রয়েছে, সে গুনাহের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেয়া তার দায়িত্ব। অবশ্য ওয়াজের সুরতে তাবলীগ করা সাধারণ লোকদের জন্য অনুচিত। কেননা, এ দায়িত্ব ওলামা কেরামের। জাহেল ব্যক্তি ওয়াজ শুরু করলে সভাবতই ভুল করে বসবে। যার কারণে গোমরাহীর প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই সাধারণ লোকের উচিত ওয়ায না করে শুধু নসীহত স্বরূপ একে অপরকে শরীয়তের আহকাম জানিয়ে দেয়া। এতটুকু করাও সমাজ সংস্কারের জন্য অপরিহার্য।

সমালোচনা– ৭

মাদ্রাসা ও খানকার বিরোধিতা

আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, মাদ্রাসা ও খানকাকে তাবলীগের বিপক্ষ একটি বিষয় মনে করা হয়। বস্তুত এটিও একটি উদ্ভট প্রশ্ন। কেননা, মাদ্রাসা খানকা ও তাবলীগ জামাত প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন ফায়দা রয়েছে। আর খানকা ও মাদ্রাসাতে সাধারণতঃ যারা আগ্রহী হয়ে এসে থাকে তারাই উপকৃত হয়। অপরপক্ষে তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে আগ্রহী-অনাগ্রহী, জাহেল-অজ্ঞ সকলকেই দ্বীনের দিকে টেনে আনা হয়। সুতরাং এর ফায়দা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, তাবলীগ জামাত মাদ্রাসা ও খানকা থেকে অধিক গুরুত্বের অধিকারী এবং অধিক পরিপূর্ণ।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ) জনৈক আলেমের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রচলিত দরস ও তাদরীস (পঠন-পাঠন) মূল লক্ষ্যের ভূমিকা মাত্র। আর মূল লক্ষ্য হল তাবলীগ। অধুনা সবচে' বড় ত্রুটি হল যে, দরস ও তাদরীসকে মূল লক্ষ্য মনে করা হচ্ছে। ফলে যেসব ওলামা কেরাম তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন না তারা বিরাট এক ফযীলত থেকে বঞ্চিত থেকে যান। আর এই 'তাবলীগ'ই ছিল আম্বিয়া কেরামের দরস।

সুতরাং প্রথমে দরস ও তাদরীস আর ইলম থেকে ফারেগ হয়ে তাহসীল ও

তাবলীগ উভয়টিরই হক্ক আদায় করা উচিত। কোন একদিকে ঝুঁকে পড়ে অন্যদিক থেকে উদাসীন হয়ে পড়া মারাত্মক ক্ষতিকর। উলামা কেরামের এদিকে অবশ্যই দৃষ্টিপাত করা উচিত এবং তাবলীগেও কিছু সময় ব্যয় করা উচিত। অধুনা মাদ্রাসাগুলোতে সবচে' বড় ত্রুটি হল এই যে, ওলামা কেরাম পঠন পাঠনে যে পরিমাণ ব্যস্ত সে তুলনায় তাবলীগের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করছেন না। পঠন পাঠনের তুলনায় অর্ধেক সময়ও তাবলীগে ব্যয় হয় না।

অনুরূপভাবে আরেক আলেমের প্রশ্নের জবাবে মাওলানা থানুভী (রহঃ) ইরশাদ করেন, দ্বীনে এলাহীতে তাবলীগই হল মূল। আর দরস ও তাদরীস তার ভূমিকামাত্র। তবে শর্ত হল অনর্থক কোন ফিৎনা ফ্যাসাদে যেন জড়িয়ে না পড়তে হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় নীরব থাকাই উত্তম।

একবার আমি রেলগাড়ীর সফরে জনৈক ব্যক্তিকে টাখনুর নীচে পায়জামা পরতে দেখে তাকে বাধা দিয়ে বললাম যে, এটা শরীয়ত পরিপন্থী; সুতরাং তোমার পায়জামা ঠিক করে নেয়া উচিত। অমনি লোকটি শরীয়তকে মা তুলে গালি-গালাজ শুরু করে। সেদিন থেকে বিনা প্রয়োজনে কাউকে কিছু বলা ছেড়ে দিয়েছি। কেননা এতক্ষণ তো গুনাহগার ছিল এখন তো কুফর পর্যন্ত গড়াল।

(ইফাযাতে ইয়াওমিয়াহ– ১ম খণ্ড)

একবার বলেন, আল্লাহর পথে দাওয়াতই হল মূল কাজ। আর এ দাওয়াতকে সুরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মাদ্রাসার প্রয়োজন। সুতরাং মাদ্রাসা থেকে প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করার পর আল্লাহর পথে দাওয়াতেও কিছু সময় ব্যয় করা উচিত, যার সহজ পদ্ধতি হল ওয়াজ করা, আর পঠন-পাঠন হল তার ভূমিকা। সুতরাং এ দায়িত্বও আঞ্জাম দেয়া উচিত। যেমন নামাযের জন্য প্রয়োজন অযুর, আর ওযুর জন্য প্রয়োজন পানি সংগ্রহ করা। অনুরূপভাবে তাবলীগের জন্য প্রয়োজন পঠন-পাঠন। কিন্তু শুধু ওযু আর পানি সংগ্রহের পিছনে পড়ে থেকেই নামাযের সময় পার করে দেয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? অথচ আমরা মূল কাজ 'হক্বের দিকে দাওয়াত'কে ভুলে গিয়ে তার ভূমিকা পঠন ও পাঠনেই ব্যস্ত হয়ে আছি। পরিতাপের বিষয়, যারা দাওয়াতের যোগ্য ছিল তারাই দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়ে ভূমিকার পিছনে পড়ে রয়েছে।

(আত্ তাবলীগ– ২০ ওয়াজ, দাওয়াত ইলাল্লাহ)

বিগত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর দৃষ্টিতে মাদ্রাসা ও খানকার কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিল। তাদের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা ও খানকা তাবলীগ জামাতের জন্য জমি চাষ দেয়া তুল্য। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাদ্রাসা ও খানকাতে একমাত্র তারাই আসবে যাদের মাঝে দ্বীনের তলব রয়েছে। আর লোকদের মাঝে দ্বীনের তলব পয়দা করার জন্য ব্যাপক তাবলীগই একমাত্র উপায়।

বলাবাহুল্য যে, দ্বীনের সহী তলব না জন্মানো পর্যন্ত মাদ্রাসা ও খানকাকে জিজ্ঞাসা করার মত লোক পাওয়া যাবে না। তাবলীগের বিগত ইতিহাস খুলে দেখুন; এক মেওয়াত অঞ্চলেই যেখানে ইসলামের নাম গন্ধও ছিল না সেখানে বিগত চল্লিশ বছরে হাজারের উর্ধ্বে আলেম জন্ম নিয়েছে এবং অসংখ্য সালেকীন হযরত থানুভী (রহঃ), হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) ও হযরত রায়পুরী (রহঃ)-এর খেলাফত লাভ করেছেন।

আল্লামা আলী মিয়া হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে লিখেন যে, হযরত মাওলানা খুব ভালোভাবেই এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের ঈমান একীনই যেখানে অবনতিশীল, দ্বীনের আযমত ও মর্যাদাবোধই যেখানে অন্তর থেকে বিলুপ্তপ্রায়, দ্বীনের প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিষয়গুলো থেকেই সাধারণ মুসলমান যেখানে বঞ্চিত হয়ে চলেছে; সেখানে দ্বীনের উচ্চস্তরীয় বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কিছুটা অকালচেষ্টাই বটে। কেননা হৃদয়ের মাটিতে দ্বীনের শিকড় মজবুত হয়ে যাওয়ার পরই হলো এগুলোর উপযুক্ত ক্ষেত্র। আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মন-মানস ও চিন্তা-প্রবণতার ক্রমোস্ফীত ঢলের গতিমুখ তিনি ধরে ফেলেছিলেন এবং যথার্থই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, নতুন নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দ্বীনী মারকাজ গড়ে তোলা তো দূরের কথা, এমতাবস্থায় পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলোর অস্তিত্বও শংকামুক্ত নয়। কেননা যে সকল ধমনী দ্বারা ধর্মীয় কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে জীবন-শোণিত সঞ্চালিত হতো উম্মতের দেহাভ্যন্তরে; সেগুলো ক্রমশঃ শুষ্ক ও সংকুচিত হয়ে আসছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি এবং সেগুলোকে রক্ষার গুরুত্ববোধ এবং সেখানে কর্মরতদের দ্বীনী খেদমত ও অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির মানসিকতা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে চলেছে।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আল-হাজ শায়েখ রশীদ আহমদ সাহেবের নামে লেখা হযরতের এক দীর্ঘ চিঠি উদ্ধৃত করেন, যাতে তিনি মাদ্রাসার গুরুত্ব এবং মাদ্রাসাগুলো অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাব্‌লীগের প্রয়োজনীয়তার আলোকপাত করেন।

এরপর এ চিঠির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী মিয়া লিখেন; মুসলমানদের কল্যাণের জন্য মাদরাসার অস্তিত্বকে মাওলানা অপরিহার্য মনে করতেন এবং মুসলমানদের মাথার উপর থেকে এ রহমত-ছায়া উঠে যাওয়াকে বিপদ-মুছীবত ও আযাব-গযবের কারণ মনে করতেন।

তবে মাওলানা মনে করতেন যে, আজকের দ্বীনী মাদরাসাগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদেরই অবদান এবং তাদেরই তৈরী ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আসল দ্বীনী দাওয়াত ও মেহনত মোজাহাদার বরকতে মুসলমানদের অন্তরে দ্বীনের যে তলব ও কদর পয়দা হয়েছিলো তারই ফলে দ্বীনদার মুসলমানগণ আগামী প্রজন্মের হাতে দ্বীনকে তুলে দেয়া এবং দুনিয়াতে কায়েম ও জিন্দা রাখার জন্য দেশব্যাপী মক্‌তব মাদরাসার জাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং সৌভাগ্য মনে করে সেগুলোর খিদমতে আত্মনিয়োজিত হয়েছিলেন। সেই প্রাচীন উৎস থেকে উৎসারিত জযবা উদ্দীপনার যে ক্ষীণ ধারা মুসলমানদের প্রায় বিশুষ্ক হৃদয় ভূমিতে এখনো মরা নদীর মতো বয়ে চলেছে তারই কল্যাণে দেশের মক্‌তব মাদরাসাগুলো এখনো সচল সজীব রয়েছে এবং দ্বীন শিক্ষার্থী ও তালিবে ইলমদের আগমন কিছুটা হলেও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত তিক্ত ও দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, ধর্মানুরাগ ও দ্বীনী জযবার এ অমূল্য সম্পদ বৃদ্ধি লাভের পরিবর্তে দিন দিন মারাত্মক ভাবেই হ্রাস পেয়ে চলেছে। বলাবাহুল্য যে, এ সুরতেহাল দ্বীন ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যত অস্তিত্বের জন্য খুবই আশংকাজনক। (দ্বীনি দাওয়াত)

সমালোচনা– ৮

আলেমদের বর্তমানে জাহেলদের আমীর নিযুক্তকরণ

মৌখিক এবং লিখিতভাবে এ প্রশ্নটি কয়েকবার এসেছে যে, অনেক সময় আলেমদের বর্তমানে জাহেলদের আমীর নিযুক্ত করে দেয়া হয়। বাহ্যত প্রশ্নটি

বেশ গুরুত্বের অধিকারী হলেও বাস্তব সত্য এই যে, কোন বিষয়ের নেতৃত্ব দানের জন্য নিছক ইলমই যথেষ্ট নয়; বরং পরিচালনার যোগ্যতা এবং চিন্তা-ফিকিরের দক্ষতাও আবশ্যক। তাছাড়া উত্তম জনের বর্তমানে অনুত্তম জনকে আমীর নিযুক্ত করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই চলে এসেছে। যেমন, তিনি হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-কে বিভিন্ন বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেছেন।

সমালোচকদের কোন যুগেই অভাব ছিল না। সুতরাং কতক লোক এ বিষয়ে আপত্তি তুলে বসল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা দান করলেন এবং হামদ ও সালাতের পর ইরশাদ করলেন–

তোমরা উসামার নেতৃত্বে আপত্তি তুলছ, আর তোমরা এর পূর্বেও তাঁর পিতা যায়েদের নেতৃত্বে আপত্তি তুলেছিলে। আল্লাহর কসম! সে নেতৃত্বের হকদার এবং আমার অধিক প্রিয়। (বুখারী)

তার উপর অভিযোগের এটিও একটি দিক ছিল যে, একজন নবযুবককে শীর্ষস্থানীয় মুহাজেরদের উপর আমীর নিযুক্ত করা হল। (হায়াতে সাহাবা)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন সায়াহ্নে হযরত উসামা (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তা বাস্তবায়ন করেন। হাদীছ ও সীরাতগ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যে, প্রথমতঃ এভাবে এ বাহিনী পাঠানোর ব্যাপারেই লোকেদের আপত্তি ছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) এ ব্যাপারে অবিচল ছিলেন যে, যে বাহিনী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরী করে গেছেন তাকে আমি বাধা দিতে পারি না।

অতঃপর আনসাররা হযরত ওমর (রাঃ)-কে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে আলোচনার জন্য পাঠালেন যে, যদি একান্তই এই বাহিনী প্রেরণ করতে হয় তাহলে আমাদের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক আমীর নিযুক্ত করে দিন। হযরত ওমর (রাঃ) এই বার্তা নিয়ে পৌঁছলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর দাড়ী ধরে বললেন, তোমার মরে যাওয়া ভাল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আমীর নিযুক্ত করে গিয়েছেন। আর তুমি আমাকে বলছ, তাকে নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কার করে দেই।

হযরত ওমর (রাঃ) তাদের কাছে গিয়ে বললেন, অপদার্থগুলো! তোমাদের কারণে আমাকে আল্লাহর রাসূলের খলীফার তিরস্কার শুনতে হল। (ঘটনাটি বেশ দীর্ঘ।) [হায়াতে সাহাবা]

অনুরূপভাবে একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। অথচ সে জামাতে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। বিস্তারিত হাদীছ (হায়াতুস্ সাহাবা)-তে রয়েছে।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহানিয়ায় যে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন, তাতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহশ (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করেন এবং ইরশাদ করেন, সে তোমাদের থেকে বেশী উত্তম নয়, তবে ক্ষুৎপিপাষায় অধিক ধৈর্যধারণকারী। (হায়াতুস্ সাহাবা, ২ খণ্ড)

এর দ্বারা বুঝা গেল, আমীর নিযুক্ত করার ব্যাপারে নিছক শ্রেষ্ঠত্বই বিবেচ্য নয়; বরং আরো অনেক কিছু দেখার রয়েছে।

একবার হযরত কায়েস বিন সাআদকে একদল সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন অথচ সে বাহিনীতে হযরত ওমর বিন খাত্তাব এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ)ও ছিলেন। (হায়াতুস্ সাহাবাহ, ২য় খণ্ড)

একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) তার খেলাফত আমলে ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানকে আমীর নিযুক্ত করলেন। আর তার অধিনে ছিল 'আমীনু হাযিহিল উম্মাহ' (উম্মতের বিশস্ত ব্যক্তি) হযরত আবু উবায়দাহ ও 'ইমামুল উলামা' হযরত মু'য়ায বিন জাবাল (রাঃ)। এ উপাধী তারা স্বয়ং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছিলেন। [বিস্তারিত ঘটনা হায়াতুস্ সাহাবাতে রয়েছে]

হযরত আবু বকর (রাঃ) মুহাজের ও আনসারদের এক বিরাট জামাতের উপর আমীর নিযুক্ত করে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছ যে, তোমাকে এমন কতক লোকের উপর আমীর নিযুক্ত করেছি যারা তোমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের ব্যাপারে তাঁরা তোমার কাছে মুহতাজ নন। সুতরাং আখেরাতের শাসক বনতে চেষ্টা কর। সব বিষয়ে

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কর। (হায়াতুস্ সাহাবা)

ইফাযাতে ইয়াওমিয়াতে হাকীমুল উম্মত হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসেম যখন হিন্দুস্তানের উপর আক্রমণ করল তখন তার বয়স ছিল সতের বছর। অথচ সেনাবাহিনীতে বড় বড় প্রবীণ অভিজ্ঞ লোকেরাও ছিলেন। কিন্তু সকলেই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এসবই ঈমান ও স্বচ্ছবোধের বদৌলতে ছিল। কারণ সতের বছর বয়সে একটি দেশের উপর চড়াও করা স্বাভাবিক নয়। আসলে তখন যুগ ছিল নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের নিকটবর্তী, তখন দ্বীনের সমঝ ছিল মানুষের মাঝে ব্যাপক। এরপর নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সময়ের যতই ব্যবধান ঘটেছে ততই এ বিষয়ে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

বস্তুত আমীর হওয়ার জন্য শুধু বয়ঃবৃদ্ধ, শ্রেষ্ঠ কিংবা বড় জ্ঞানী হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সবচে' বেশী জরুরী বিশেষতঃ সফরের সময় সাহসিকতা, শক্তি এবং ধৈর্যধারণ ক্ষমতা। তাবলীগ জামাতে আমীর নিযুক্তির সময় বিশেষভাবে যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তা হল; ইতিপূর্বে তিনি কখনো জামাতে সময় লাগিয়েছেন কিনা। কেননা, জামাতে যে একবার সময় লাগিয়েছে স্বভাবতই তার অভিজ্ঞতা অন্যদের তুলনায় বেশী হবে। এজন্যই অনেক সময় এমন অনেকের উপর কোন পুরাতন সাথীকে আমীর নিযুক্ত করে দেয়া হয়; – আর করা উচিতও – যিনি অন্য দিকে শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই ময়দানে অনভিজ্ঞ। প্রবাদে আছে–

" سل المجرب و لا تسئل الحكيم "

"প্রজ্ঞার অধিকারীকে নয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা কর।"

এজন্যই দেখা যায় অনেক অল্প ডিগ্রীধারী ডাক্তার অভিজ্ঞতার কারণে অধিক ডিগ্রীধারী ডাক্তারের চেয়েও বেশী পারদর্শী হয়ে থাকেন।

১৩৩৭ হিজরী সালে আমার প্রথম হজ্জের সফর ছিল। সে বছর মদীনার পথ বেশ বিপজ্জনক ছিল। যার কারণে মদীনার লোকজন বেশ কম এসেছিল। হজরত আমাদেরকে বললেন, আমার তো বেশ কয়েকবারই মদীনায় যাওয়ার

সুযোগ হয়েছে আর প্রত্যেকবারই সেখানে অবস্থানের নিয়তে গিয়েছিলাম। কিন্তু হযরত মাওলানা মুহিববুদ্দীন সাহেব অনুমতি দিতেন না। তোমাদের যেহেতু এটা প্রথম হজ্জ; পুনরায় আসতে পারবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই তাই তোমরা গিয়ে আস।

যাহোক আমরা রওনা হলাম। হযরত এই অধমকেই আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। অথচ, এই জামাতে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী-গুণী ও বয়ঃবৃদ্ধরাও ছিলেন। এ বিবরণ আমার রচিত 'আপ বীতী' নামক কিতাবে হজ্জের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে প্রসঙ্গতঃ তাবলীগ জামাতের উপর আরোপিত এ অভিযোগ সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। আরো বলে এসেছি যে, অনেক সময় তাবলীগ জামাতে যোগ্য লোকের অভাবের কারণে অপারগ হয়েই অযোগ্যকে আমীর বানিয়ে দিতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি প্রশ্নেরও জবাব দেয়া হয়েছে যে, যোগ্য কেউ যখন ছিল না তাহলে জামাত পাঠানোরই বা প্রয়োজন ছিল কি? বস্তুত এ প্রশ্নও অজ্ঞতা হেতু হয়ে থাকে। কেননা, তাবলীগের গুরুত্ব ও অপরিহার্য্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর এ প্রশ্নের অবতারণা মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কেননা, শরীয়তের সর্বসম্মত মাসআলা হল উম্মী ব্যক্তির নামায উম্মী ব্যক্তির পিছনে অবৈধ নয় এবং কোন কারী কিংবা আলেম নেই বলে জামাত ছাড়া নামায পড়া জায়েয নেই।

আমীর হওয়া তো স্বাভাবিক ও সাময়িক ব্যাপার। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর 'মাজালিসে ইয়াওমিয়া'তে একাধিক জায়গায় তিনি ইরশাদ করেছেন যে, অনেক সময় বুযুর্গানে দ্বীন অনেক অযোগ্যকেও বাইআতের ইজাযত দিয়ে দেন। এ বিষয়টি আমার 'আপ বীতি'তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত থানুভী (রহঃ) তাঁর এক দীর্ঘ আলোচনায় বলেন, কারো ইমাম হওয়ার পিছনে আর কোন যুক্তি না থাকলেও এ একটি যুক্তিই যথেষ্ট যে, অযোগ্যতা সত্ত্বেও যখন সকলে মিলে কাউকে ইমাম বানিয়ে দিচ্ছে তখন অসম্ভব কিছুই না যে, আল্লাহ পাক তাকে মানুষের নেক গুমানের উপর যোগ্য করে

দিবেন। এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে যে, বুর্যুগানে দ্বীন অনেক অযোগ্যকে খেলাফত দিয়ে দিয়েছেন। পরে আল্লাহ পাক এর বরকতে তাকে যোগ্যতা দান করে দিয়েছেন। (মাজালেসুল হিকমাহ)

১৩৩০ হিজরী সালে ২৭ বছর বয়সে হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর বিয়ে হল। এ বিয়ের অনুষ্ঠানে আ'লা হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, হযরত আল-হাজ খালিল আহমদ সাহেব, হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। হযরত দেহলুভী (রহঃ)-কে ইমামতীর জন্য আগে বাড়িয়ে দেয়া হল, তখন সে পরিবারের মুরুব্বী হযরত মাওলানা বদরুল হাসান (রহঃ) উপহাসের ছলে বলে উঠলেন, এত ভারী ভারী ডাব্বার ইঞ্জিন এত ছোট! হযরত হাকীমুল উম্মত জবাবে বললেন, ইঞ্জিন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে অসুবিধার কি আছে?

মোটকথা, স্বল্প বয়স্ক আমীরও অনেক সময় জামাত অধিক কাবু করতে সক্ষম হয়।

সমালোচনা– ৯

হযরত থানুভী (রহঃ) ও হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ)-এর অপছন্দঃ

আরেকটি প্রশ্ন প্রায় শোনা যায় যে, হযরত হাকীমুল উম্মত ও হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) প্রচলিত এ তাবলীগকে পছন্দ করতেন না।

হযরত শায়খুল ইসলাম সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা আসছে যে, তিনি বরাবর বিভিন্ন তাবলীগী ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছেন। আর হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর খেদমতে ১৩৪০ হিজরী সালে বজলুল মজহুদ ছাপাকালে প্রায়ই হাজির হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। অবশ্য তাবলীগের এ আন্দোলন তখনও শুরু হয়নি। তারপর হিজরী ১৩৪৬ সালে হেজাজ থেকে ফেরার পর থেকে ১৩৬২ সালের ১৬ ই রজব অর্থাৎ হযরত হাকীমুল উম্মতের মৃত্যু পর্যন্ত বরাবর হাজির হয়েছি। প্রতি মাসে সম্ভব না হলেও দু' মাস অন্তর অবশ্যই একবার সাক্ষাত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে কখনও হযরতের মুখ থেকে

তাবলীগের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিনি। অবশ্য মানুষের মুখে শুনি যে, তিনি নাকি তাবলীগ-বিরোধী ছিলেন। আর হযরতের শীর্ষস্থানীয় খোলাফাদের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে সামনে আসছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা কি পরিমাণ তাবলীগের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। অপরপক্ষে বিভিন্ন সূত্রে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর এ উক্তি শুনেছি যে, মৌলভী ইলিয়াস নিরাশাকে আশায় পরিণত করে দিয়েছেন।

হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে আল্লামা আলী মিয়া উদ্ধৃত করেন যে, একবার হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) হযরত হাকীমুল উম্মতের সাথে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাইলে তিনি ইরশাদ করলেন, এ বিষয়ে কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেননা, যুক্তির প্রয়োজন তো হয় কোন কিছুর সত্যতা প্রমাণের জন্য। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত। সুতরাং কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। সত্যি কথা বলতে কি; আপনি তো মাশাআল্লাহ 'নিরাশা'কে 'আশায়' পরিণত করে দিয়েছেন।

প্রথম দিকে হযরতের একটু দ্বিধা ছিল যে, ইলম ছাড়া এরা কিভাবে তাবলীগের এ গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিবে। কিন্তু যখন হযরত মাওলানা জাফর আহমদ (রহঃ) সাহেব তাঁকে বললেন যে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা মারকায থেকে শিখিয়ে দেয়া সীমিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না, তখন তিনি সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হন।

আর এ বিষয়ে তো পিছনে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, তাবলীগ আর ওয়াযের মধ্যে পার্থক্য কি এবং ওয়ায করার জন্য আলেম হওয়া শর্ত হলেও তাবলীগ সবাই করতে পারে। এ প্রসঙ্গে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর মন্তব্য পিছনে বিশদ আলোচিত হয়েছে। এরপরও যদি তিনি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন সমালোচনা করে থাকেন তবে নিঃসন্দেহে হয়ত তাঁর কাছে কোন জাহেল ব্যক্তির ওয়াজ, কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অসংগত আচরণের কথা শোনানো হয়েছে। সে হিসাবে তাঁর সমালোচনা যথার্থই ছিল।

প্রায় আট বছর হল এক ব্যক্তি তার চিঠিতে একই প্রশ্ন করেছিলেন যে, এ তাবলীগ জামাত সম্পর্কে হযরত হাকীমুল উম্মতের মূল্যায়ন কি? তিনি কি এটা অপছন্দ করতেন? দ্বিতীয়তঃ আমার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার শায়খ

আমাকে এতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন না। অথচ আমি এটাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করি। এ মুহূর্তে আমার করণীয় কি? আমার এ চিঠি সে সময়ই আমার রচিত 'চশমায়ে আফ্‌তাব' কিতাবে মুদ্রিতও হয়েছিল। পূর্ণ চিঠিটি এখানে পূনরায় উল্লেখ করছি–

"বাদ তাসলিম আরয এই যে, আপনার চিঠি যথাসময়ই হস্তগত হয়েছে। হযরত থানুভী (রহঃ) এ জামাতকে অপছন্দ করতেন বলে আমার জানা নেই; বরং আমার জানামতে তিনি একাধিকবার নিজামুদ্দীন; এমনকি মেওয়াতেও তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন। আর আমার চাচা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)ও প্রায়ই থানাভোন তাঁর খেদমতে হাজির হতেন। সে সময় প্রায় এ অধমেরও সাথে থাকার সুযোগ হতো। চাচাজান প্রত্যেকবারই তাঁর এ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং হযরত (রহঃ) খুশী প্রকাশ করতেন এবং দু'আও দিতেন।

এটা তো আমার নিজের দেখা বিষয়; অবশ্য এ কথা আমিও শুনে আসছি যে, হযরতের খোলাফা ও মুতাআল্লিকীনদের অনেকে এটা পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে আমার মতামত হল, তাঁদের তাবলীগ জামাতকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। লোকমুখে শুনেই অভিমত পোষণ করেছেন। তাছাড়া যেহেতু এ জামাতের সংঘবদ্ধ কোন দল নেই; বরং আপনি নিজেও দেখেছেন যে, এতে সবদেশের এবং সব ধরনের লোক সমবেত হয়। ফলে তাবলীগের উসূল সম্পর্কে আনাড়ী অনেক নতুন মানুষ থেকে অনেক সময় বেউসূলিও হয়ে যায়।

এ অধমের তাবলীগ জামাতকে গোড়া থেকেই অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। এখনও বিভিন্ন জামাতের কারগুজারী প্রচুর দেখার ও শোনার সুযোগ মিলছে। আমার দৃষ্টিতে বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ আন্দোলন অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এর উসীলায় হাজার নয়; বরং লাখো লাখো বেনামাযী ও বদ্‌দ্বীন দ্বীনদার বনে গেছে। এরও সংখ্যা কম মিলবে না যে, যারা এক সময় মসজিদ-মাদ্রাসা ও ওলামা কেরামের নাম শুনতে পারতো না তারা

এখন মসজিদ-মাদ্রাসার পাগল। শুধু হিন্দুস্তান, পাকিস্তানেই নয়; বরং আরব দেশগুলো সহ ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ এখন দ্বীনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের অনাবাদ মসজিদগুলোতে এখন রীতিমত শুধু নামাযই নয় বরং তারাবীহও পড়া হচ্ছে।

এ কথা অস্বীকার করছি না যে, এ জামাতের কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া কোন দল বা সংগঠন আছে? লাভ লোকসান মিলেই বিচার করা আবশ্যক। হযরত থানুভী (রহঃ)-এর খলীফা এবং আমাদের মাদ্রাসার নাজিম আল-হাজ্জ মাওলানা আসাদুল্লাহ সাহেবও বায়আত করার সময় মুরীদদেরকে এ বিষয়ে তাগিদ করেন। এ ছাড়াও আরও অনেক পীর বুযুর্গ তাদের মুরীদদের এ বিষয়ে তাগিদ করে থাকেন।

হযরত থানুভী (রহঃ)-এর আর একজন বিশিষ্ট খলীফা হযরত মুফতী শফী সাহেব পাকিস্তানী। একবার হজ্জ থেকে এসে আমার উপস্থিতিতে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেবকে তার মাদ্রাসায় ডাকিয়ে নিয়ে এ আন্দোলনের উপর জোরদার তকরীর করান।

এই মধ্যে মাওলানা উবায়দুল্লাহ ছাহেব মদীনা থেকে পাকিস্তান হয়ে আসেন। তিনিও বলেন যে, মুফতী ছাহেব অত্যন্ত জোর দিয়েই এ দিকে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজেও তার তাকরীরের পর জোরদার সমর্থন করেন।

এসব সত্ত্বেও আপনার সম্পর্কে আমার পরামর্শ হল, আপনার শায়খের অনুমতি ছাড়া এতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। অবশ্য আপনার শায়খ অনুমতি দিলে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। আর আপনার শায়খের অনুমতি না পাওয়ার কারণে যদি অংশগ্রহণ নাও করেন, বিরোধিতা যেন না করেন। কেননা, আমার দৃষ্টিতে এ জামাতের সাথে আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে। এ জামাত সম্পর্কে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বহু সূত্রে

বিভিন্ন সুসংবাদ শোনা যাচ্ছে এবং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে স্বপ্ন মারফত অনেককেই এতে অংশগ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

এর দৃষ্টান্ত হল যেমন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

ارى رؤياكم قد واطئت فى السبع الاواخر الحديث

শেষের সাত দিনের ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্নগুলো দেখছি এক হয়ে যাচ্ছে।

এ হাদীছের আলোকে স্বপ্নযোগে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতগুলো সমর্থন এবং আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মতে এ জামাতের বিরোধিতা করা অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়।

অংশগ্রহণ না করা ভিন্ন জিনিস। ব্যক্তিগত কোন বিশেষ ওজরের কারণে কিংবা মনে না চাওয়ার কারণে কেউ হয়ত অংশগ্রহণ না করতে পারে, সেটা আমার দৃষ্টিতে এত আশংকাজনক নয়। কিন্তু বিরোধিতা ভিন্ন জিনিস। এটাত হল আমার অভিমত। প্রকৃত বিষয় আল্লাহই ভাল জানেন। অবশ্য কোন স্পষ্ট ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করার অনুমতি অবশ্যই আছে।

যাহোক, এ অধমের বিভিন্ন ব্যস্ততা ও অসুস্থতার কারণে বিস্তারিত লেখা সম্ভব হয়নি। আপনার সাথে মাদ্রাসার সূত্রে বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে সংক্ষিপ্তভাবে নিজের অভিমত পেশ করলাম। যদি সত্য লিখে থাকি, তবে এটা আল্লাহর দান। আর যদি ভুল লিখে থাকি, তবে সেটা আমারই অপরাধ এবং শয়তানের কারসাজী, ওয়াস্‌সালাম।"

যাকারিয়া, মাজাহেরুল উলূম
সাহারানপুর
লিপিবদ্ধকরণে, মুহাম্মদ ইসমাঈল সুয়ুতী
১৩ জুমাদাছ্ ছানী– ১৩৮৪ হিজরী

হযরত থানুভী (রহঃ) যদি কখনো কোন মুবাল্লিগ কিংবা জামাত সম্পর্কে কোন সমালোচনা করে থাকেন, তবে তা অস্বীকার করছি না। হযরত (রহঃ)-এর শাসন ও সংশোধন সম্পর্কে কার জানা নেই? ছাত্র শিক্ষক বিশেষতঃ তার খাদেম ও এজাযতপ্রাপ্তরা কেউ তাঁর শাসন থেকে রেহাই পায়নি। তিনি নিজেই বলেন, আমার ঝগড়া (শাসন) থেকে বেঁচেছে এমন কেউ নেই। (ইফাযাত)

'খান খলীলের' পরিশিষ্টে জামঃ ৮-এর টীকায় হযরত থানুভী (রহঃ)-এর ইরশাদ উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এজাযতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও মানুষের ভুল হতে পারে।

এই মুহূর্তে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ছে, যা আল-ইমদাদ সাময়িকীর মুহাররম ১৩৩৬ হিজরীতে উদ্ধৃত রয়েছে।

একবার হযরতের ইজাযত প্রাপ্ত জনৈক মাওলানা এই মর্মে একটি চিঠি লিখে হযরতের খেদমতে পেশ করেন যে, আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। সেখানে অনেক ফিৎনা বিরাজ করছে; আপনি কিছু বলে দিন তাহলে আমি একটু মনঃবল পাব। হযরত ইরশাদ করলেন, কি বলবো?

জবাবে তিনি পাশ কেটে যেতে চাইলেন। হযরত ইরশাদ করলেন– পরিষ্কার বল, তোমার এই চিঠিতে কি বুঝাতে চেয়েছ। তখন তিনি আরজ করলেন, অর্থাৎ বলে দিন যে, আল্লাহ সহায়ক। হযরত ইরশাদ করলেন, এটা তো এমন বিষয় হল, যা জিজ্ঞাসা করতে আমাকে তোমার মুখাপেক্ষী হতে হল। আর তুমি তো আমার বলার আগেই জানো। তারপর আমার মুখ থেকে বের করানোর কি প্রয়োজন ছিল। তারপর বললেন, সরে যাও এখান থেকে, কথা বলা শিখনি। দু'আ চাওয়ার প্রয়োজন ছিল স্পষ্ট বলতে, দু'আ করুন। উপস্থিত এক ভদ্রলোক তাঁর পক্ষে সুপারিশ করতে চাইল। হযরত তাকেও ধোলাই করলেন। আল-ইমদাদ সাময়িকীতে এ ঘটনা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

এর চেয়ে বড় লক্ষণীয় ঘটনা হল, হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর একান্ত আপনজন ও তার চিকিৎসক এমনকি হযরত তাঁকে প্রিয়, বিশ্বস্ত ও

নিকটতম বলে সম্বোধন করতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও একবার হযরত লক্ষ্মৌতে শিফাউল মালিক সাহেবের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। হাকীম সাহেব তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে শিফাউল মালিকের কাছে হযরতের কি রোগ তা জানতে চাইলেন। এ অনধিকার চর্চার কারণে হযরত থানুভী তাকে যে কঠোর ভাষা লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চিঠিটি ইফাযাতে ইয়াওমিয়া ৯ম খণ্ড দ্বিতীয় অংশ মলফুজ নম্বর ১৩৩-শে উদ্ধৃত হয়েছে।

এখানে শুধু আমার জিজ্ঞাস্য, এ ঘটনা থেকে আমরা কি এ কথা বুঝব যে, হযরত হাকীমুল উম্মত হাকীম মুহাম্মদ মোস্তফার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন কিংবা তিনি ধিকৃত হয়ে গিয়েছিলেন?

হযরত হাকীমুল উম্মতের বড় ভাগ্নে মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেব (রহঃ) সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাকে আমি সবচে' বেশী ভালবাসি; এশ্‌কের পর্যায়ে বলা যেতে পারে। অথচ তার সাথেই সবচে' বেশী কঠোরতা করি।

একবার সাহারানপুরের এক জলসায় মাওলানা সাঈদ সাহেব অত্যন্ত জোরদার তকরীর করেন এবং শ্রোতাদের মাঝে এক আলোড়ণ সৃষ্টি করে দেন। ওয়াজের পর হযরত তাঁকে সামান্য একটি বিষয়ে ভরপুর মজলিসে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন, যাতে তাঁর মাঝে কোন প্রকার আত্মগৌরব না এসে যায়। পরে হযরত নিজেও এ মুসলেহাতের কথাই বলেছেন। (আশরাফুস সওয়ানেহ)

এবার বলুন, এ তিনটি ঘটনা কিংবা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা কি এ কথা বলতে পরি যে, হযরত তাঁর সকল খোলাফা এবং আপনজনদের প্রতি অসন্তুষ্টি ছিলেন কিংবা তাদের তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন? অনুরূপভাবে কোন মুবাল্লিগ বা জামাত সম্পর্কে যদি হযরতের কাছে সত্য-মিথ্যা কোন সমালোচনা পৌছে থাকে আর তার ভিত্তিতে তিনি তাদের শাসিয়ে থাকেন, তবে কি তা অসঙ্গত হবে? আর এ ভিত্তিতে কি এ কথা বলা ঠিক হবে যে, হযরত জামাতের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। বিশেষতঃ এ কথা সর্বজন বিদিত যে, বুযুর্গদের খেদমতে মিথ্যা কথা পৌছানো মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

খান খলীলের ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আকদাস সাহারানপুরীর এ বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহওয়ালাদের কাছে মিথ্যা কথা পৌছিয়ে আল্লাহওয়ালাদের মনে কষ্ট দিয়ে কি যে স্বাদ পায় তা তারাই জানে।

হযরত হাকীমুল উম্মতের ইফাযাতে ইয়াওমিয়াতে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এজন্যই বুযুর্গগানে দ্বীনদের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর যেসব তিরস্কার হয়ে থাকে তা নিছক সাময়িক। এজন্য সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে দায়ী করা হবে নিছক অজ্ঞতা কিংবা চিত্তের অনুদারতা।

স্বয়ং হযরত থানুভী (রহঃ) বলেন যে, যাদেরকে শাসন কিংবা তিরস্কার করি বাস্তব সত্য এই যে, তাদের ব্যাপারে মনে চায় তারা আমার চেয়েও ভাল হয়ে যাক। অবশ্য সাধারণ মানুষ এটাকে সম্পর্ক ছিন্নতা মনে করে। (ইফাযাতে ইয়াওমিয়া)

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীছ উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত হুযাইফা (রাঃ) মাদায়েন শহরে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কিছু হাদীছ বর্ণনা করতেন, যা তিনি কতক লোক সম্পর্কে গোস্বার হালতে বলেছিলেন। অতঃপর শ্রোতারা হযরত সালমান ফারসীর কাছে গিয়ে বর্ণনা করলে তিনি বলতেন, হযরত হুযায়ফাহ তার হাদীছ সম্পর্কে নিজেই ভাল জানেন। লোকেরা পুনরায় হযরত হুযায়ফাহ (রাঃ)-এর কাছে এসে বলত, আপনার হাদীছগুলো হযরত সালমান শুনে তা সম্পর্কে সত্য মিথ্যা কিছুই মন্তব্য করেননি।

এ কথা শুনে হযরত হুযাইফাহ (রাঃ) হযরত সালমানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার হাদীছগুলো সত্যায়ন করেননি কেন? অথচ আপনি নিজেও এগুলো নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। হযরত সালমান (রাঃ) বললেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় গোস্যার হালতে অনেকের সম্পর্কে অনেক কিছু বলে ফেলতেন। অপর পক্ষে অনেক সময় আনন্দের হালতে অনেকের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকতেন। তোমার এসব রিওয়ায়েত বর্ণনা করা দ্বারা মানুষের মনে অনেকের প্রতি শ্রদ্ধা আর অনেকের প্রতি ঘৃণা জন্মাচ্ছে। ফলে পরস্পরে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

একবার খুৎবাদানকালে বলেছিলেন যে, আমি একজন মানুষ; অন্যদের মত আমারও গোস্যা পায়, সুতরাং গোস্যার হালতে আমি যাকে কিছু বলে ফেলেছি; আয় আল্লাহ আপনি আমার এ কথাকে লোকদের জন্য রহমত এবং কিয়ামতের দিনের জন্য বরকত স্বরূপ করে দিন।

সুতরাং তুমি এসব রিওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়ত ক্ষান্ত কর অন্যথায় আমি আমীরুল মুমিনীনের নিকট তোমার নামে নালিশ করে দিব।

(বাযলুল্ মাজহুদ– ৫ম খণ্ড)

স্বয়ং হযরত থানুভী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহওয়ালাদের নিকটতর ব্যক্তিদের মাঝে দু একজন এমনও থাকে যারা শায়খের কাছে সর্বদা সত্য-মিথ্যা কথা লাগিয়ে শায়খকে এবং অন্যদেরকে অস্থির করে তোলে। নিজ ইচ্ছামত শায়খকে কারো প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেয় আবার কারো প্রতি সন্তুষ্ট করে দেয়। তবে আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের পূর্বসূরীরা এ ব্যাপারে বেশ সতর্ক ছিলেন। হযরত মাওলানা কাসেম ছাহেব (রহঃ) কারো সম্পর্কে কোন অভিযোগ শুনতেনই না। কেউ কারো অভিযোগ করলে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করে বলতেন, থাম; তোমার কথা শুনতে চাই না। এরপর স্বভাবতঃই তাঁর কাছে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস কারো হত না।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) সব কিছু শুনে বলতেন, তুমি তার সম্পর্কে যা কিছু বললে সব মিথ্যা। আমি তার সম্পর্কে ভালভাবেই জানি, সে এমন ব্যক্তি নয়।

জনৈক ব্যক্তি আরয করল, এহেন পরিস্থিতিতে হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) কি করতেন? ইরশাদ করলেন, একবার স্বয়ং তাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মানুষ যখন আপনার কাছে অন্য কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এতে আপনার মনে কি ক্রিয়া সৃষ্টি হয়? ইরশাদ করলেন, আমি বুঝে নেই এদের দু'জনের মাঝে মনোমালিন্য রয়েছে। অবশ্য পূর্ণ কথা শুনতেন।

'ইফাযাতে ইয়াওমিয়া'তে মাওলানা লিখেছেন, ঘটনা বর্ণনার বেলায় আমি ওলামা কেরামের বর্ণনাও বিশ্বাস করি না। কারণ আমার ধারণা, এরা ফতোয়া দানের ব্যাপারে দায়িত্বের পরিচয় দিলেও ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন না। এতে চাই কেউ অসন্তুষ্ট হোক আর সন্তুষ্ট হোক; আমার মনে

যা ছিল তাই পরিষ্কার বলে দিলাম।

একবার হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) ইরশাদ করেন, মানুষ আজকাল আল্লাহওয়ালাদের দরবারে বিভিন্ন জনের নালিশ 'হাদিয়া' স্বরূপ পেশ করে। এই মধ্যে জনৈক ব্যক্তি উভয় হযরতের কাছে গিয়ে আমার নামে নালিশ করেছে যে, দেখুন আপনার হজ্জের সফর শেষ হতেই সে (হযরত থানুভী) হাদীছের দরস শুরু করে দিয়েছে। আমি আরয করলাম, হযরত হয়ত কেউ মাছনুভী শরীফের দরছকে হাদীছের দরছ মনে করে বসেছে। হযরত ইরশাদ করলেন, আশ্চর্য মানুষ তিলকে তাল মনে করে বসে থাকে। আর হাদীছের 'দরস' যদি শুরু করেও থাকে তবে এতে অপরাধটাই বা কি ছিল! কিন্তু মানুষের এটা মারাত্মক অপরাধ যে, তারা আল্লাহওয়ালাদের কানে শুধু কথা পৌছানোর চেষ্টা করে। এটাই মানুষের আল্লাহওয়ালাদের জন্য হাদিয়া। (হাসানুল আযীয)

এ দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য যে, আল্লাহওয়াদের কাছে সত্য-মিথ্যা কথা পৌছে থাকে। সুতরাং তাঁরা যদি কোন কথার প্রেক্ষিতে কারো প্রশংসা কিংবা নিন্দা করেন তা বাস্তব ধরে নেয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। হযরত সালমান ফারসী তো নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয়াদির রক্ষক একজন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হুযায়ফাহ (রাঃ)-কেও এ ধরনের রিওয়ায়েত করার কারণে তিরস্কার করেছেন।

আমি পূর্বেও লিখে এসেছি যে, হযরত থানুভী (রহঃ)-এর শীর্ষস্থানীয় খোলাফা কেরাম তাবলীগ জামাতে প্রচুর অংশগ্রহণ করছেন।

হযরত মাওলানা ওসীউল্লাহ সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত সংক্ষেপ ভাষায় সুন্দর কথা বলেছেনঃ

"আপনাদের মুখে এ ধরনের প্রশ্ন শুনলে আমার আশ্চর্যবোধ হয়। কেননা, এ তাবলীগ আজ নতুন বিষয় রয়নি; বরং দীর্ঘ এক যুগ পার হয়ে গেছে। এখন এর উন্নতীর যুগ। ওলামা কেরাম এতে প্রচুর অংশগ্রহণ করছেন। তারা এর প্রয়োজনীয়তা এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করেই এতে অংশ গ্রহণ করছেন। এ বিষয়টি এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। এর পর আর কোন প্রকার প্রশ্নের অবতারণার অবকাশ নেই"।

বিস্তারিত চিঠি সামনে আসছে।

সমালোচনা– ১০

হযরত মাদানী (রহঃ) ও তাবলীগ জামাত

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ) সম্পর্কে অনেক সময় শোনা যায় তিনিও নাকি এই জামাতের বিরোধিতা করতেন। হযরত সম্পর্কে এ ধরনের কথা শুনলে আমার যারপর নেই আশ্চর্যবোধ হয়। অথচ হযরত (রহঃ)-এর এই জামাতের প্রতি হৃদ্যতা, উদারতদা ও উৎসাহ প্রদান মোখিক ও লিখিত এত প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে যার কোন অন্ত নেই। তারপরও এ ধরনের উক্তির অবতারণা নিছক সঠতা বৈ কিছুই নয়। এই জামাতের এজতেমাগুলোতে হযরত এত প্রচুর পরিমণে অংশগ্রহণ করেছেন, তাকরীর করেছেন এবং অন্যদের উৎসাহ প্রদান করেছেন যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। হযরতের তাকরীরগুলো স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। যার সবগুলো এই ছোট্ট পুস্তিকাতে উদ্ধৃত করা দুষ্করই বটে। শুধু তাবলীগী তাকরীরগুলোই স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। যার আংশিক অনেক পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে তার দু' একটি চিঠি উল্লেখ করছি। এর মধ্যে আমার দৃষ্টিতে দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শুরার মেম্বর হযরত আল-হাজ্জ হাকীম মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব কাঠুরী সাহেবের নামে লিখা পত্রটি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রটি হযরতের তাকরীরের বইটির সাথেও প্রকাশিত হয়েছে। যাহোক তিনি লিখেন–

শ্রদ্ধেয় জনাব!

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আশা করি ভালই আছেন। এ কথা শুনে আমার আশ্চর্যবোধ হয়েছে যে, মীরাঠ ও তার আশে-পাশের অঞ্চলগুলোতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর তাবলীগী জামাতগুলো যখন দাওয়াতী প্রগ্রাম নিয়ে আগমন করে আপনি ও আপনার বন্ধু-বান্ধবরা তাদের সাথে সহমর্মিতা, পথপ্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদান, কোন প্রকার সহযোগিতা করেন না। অথচ যাদের আমাদের আকাবিরদের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই আর না তাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রী কোন

আন্দোলনের সাথে কোন সম্পর্ক আছে। তারা মনে প্রাণে এ জামাতগুলোর সহযোগিতা করছে। আমার বুঝেই আসছে না এর কারণ কি?

মুহতারাম! এই তাবলীগী জামাত শুধু যে একটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে এমন নয়; বরং এদের উৎসাহিত করার প্রচুর প্রয়োজন রয়েছে। আর তাদের নিজেদেরও মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার, মুসলমানদের পরস্পরের একতাবোধ জন্মানোর এবং তাদের ধর্মীয় চেতনা বোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচুর প্রয়োজন। তবেই ভবিস্যতে এর অভুতপূর্ব ফলাফলের প্রবল আশা করা যায়। সুতরাং আশা করি ভবিস্যতে পূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় করে এদের উৎসাহিত করবেন। ওয়াস্‌সালাম।

(পূর্বসূরীদের কলঙ্ক)
হুসাঈন আহমদ (গুফিরা লাহু)
১৬ই সফর ১৩৬১ হিজরী

দ্বিতীয় চিঠিটি তিনি লিখেছেন প্রফেসর সৈয়্যদ আহমদ শাহ সাহেব মুরাদাবাদী-এর নামে–

শ্রদ্ধেয় জনাব!

আস্‌সালামু আলাইকুম

তাবলীগী দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া এবং এর জন্য হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর খেদমতে গিয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা গ্রহণ অত্যন্ত মুবারক পদক্ষেপ। আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং এই মুবারক উদ্দেশ্য বরং বংশ সূত্রে প্রাপ্ত এই দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার তৌফীক দান করুন। মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নামে ভিন্ন চিঠি লিখার প্রয়োজন নেই। তিনি কোন প্রকার সুপারিশ ছাড়াই আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। নিতান্ত প্রয়োজন মনে করলে আমার এই চিঠিটিই হযরতের খেদমতে পেশ করে দিয়েন। আর তাঁর খেদমতে আমার সালাম আরজ করে নেক দু'আর দরখাস্ত করবেন। ওয়াস্‌সালাম।

(পূর্বসূরীদের কলঙ্ক)
হুসাঈন আহমদ (গুফিরা লাহু)

তৃতীয় পত্রটি আফগানিস্তানের ওলামা কেরামের নামে লিখা, যার সম্পর্কে সাওয়ানেহে ইয়ূসুফীতে লিখা হয়েছে যে, এ কথা সুপ্রমাণিত হল যে, হযরত মাদানী (রহঃ) তাবলীগী জামাতের সহযোগিতায় সর্বদা এগিয়ে থাকতেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করতে কখনও পিছপা হতেন না। আফগানিস্তানে হযরতের অসংখ্য শিষ্য ও মুতা'আল্লেকীন মাশায়েখ রয়েছেন। এই জামাত যখন আফগানিস্তান রওনা হল হযরত সেখানকার কতক প্রভাবশালী ওলামা কেরামের নামে ভিবিন্ন চিঠি লিখেন, যাতে এই জামাত সেখানে গিয়ে কোন প্রকার প্রতীকূল অবস্থার সম্মুখীন না হয়।

এক চিঠিতে তিনি লিখেন;

যাঁরা আমার দৃষ্টির অন্তরালে, যাঁদের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় আমি অধির, শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা ফযলে রাব্বী ও অন্যান্য ওলামা কেরাম (আপনাদের ফয়য ও বরকত সর্বদা সমুজ্জ্বল থাকুক)।

বাদ সালাম মসনুন আরয এই যে, পত্রবাহক আমার কতক বন্ধুবর আপনাদের খেদমতে হাযির হচ্ছে। এরা কোন রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রিয় উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে না; বরং এদের একমাত্র উদ্দেশ্য দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দেয়া, তাবলীগী দায়িত্ব আদায় করা এবং আফগানিস্তানের মুসলমানদের ভুলে যাওয়া উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়া। আশা করি এঁদের সাহায্য সহযোগিতায় কোন প্রকার ক্রটি করবেন না। তাঁদের উপর বিশ্বাস করে তাঁদের দায়িত্ব যাতে সহজে আঞ্জাম দিতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিবেন। ওয়াস্‌সালাম।

(শুভাকাঙ্খী, পূর্বসূরীদের কলঙ্ক)[১]
হুসাঈন আহমদ (গুফিরা লাহু)
প্রধান শিক্ষক দারুল উলূম দেওবন্দ।
জামিয়তে ওলামা হিন্দের সভাপতি
১৩ মুহাররম ১৩৭৭ হিঃ

১। এটা হযরতের বিনয়। আল্লাহওয়ালারা নিজেদেরকে এরূপ নগণ্য ও অধম মনে করে থাকেন। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব বিলয়াবীর নেতৃত্বে এগারো জন সদস্য বিশিষ্ট এই জামাতই ছিল আফগানিস্তানে প্রেরিত প্রথম জামাত। সাওয়ানেহে ইয়ূসুফীতে এদের নাম ও বিস্তারিত কারগুজারী আলোচিত হয়েছে।

একবার বেঙ্গলৌরে তাবলীগের বিরুদ্ধে জোরদার ষড়যন্ত্র শুরু হল যে, এরা মাদ্রাসাগুলোকে 'অনর্থ বলে' মন্তব্য করে। কোন কোন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাবলীগের বিরুদ্ধে ঘোষণা পত্রও লিখা হল। পরিশেষে মীমাংসার জন্য হযরত মাদানী (রহঃ)-এর শরণাপন্ন হলে তিনি এই নিবন্ধটি লিখে পাঠিয়ে দেন। নিবন্ধটি ১৭ই মার্চ ১৯৫৭ ইং তে বেঙ্গলৌরের 'রৌশ্‌নী' নামক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই মধ্যে বিভিন্ন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাবলীগের পক্ষে-বিপক্ষে লিখা বিভিন্ন নিবন্ধ ও পোষ্টার নযরে পড়েছে, যার কোন একটিতেই ভারসাম্যতা রক্ষা করা হয়নি। বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়তের জন্য তাবলীগ জামাত ও মাদারেসে দ্বীনিয়া উভয়টিরই প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আবশ্যক, শরীয়তের সীমারেখায় থেকে কাজ করা। কেননা, যে কোন কাজ যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন তাতে শরীয়তের সীমারেখা লঙঘন করা হলে তাতে অনিষ্ট সৃষ্টি হবে নিঃসন্দেহে। সুতরাং উভয় দলের খেদমতে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে আরয, ভারসাম্যতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। অনর্থ কাদা ছুড়া ছুড়ি ও অভারসাম্যতা পরিহার করে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকুন।

সাহাবা কেরামের স্বর্ণযুগ থেকে নিয়ে অদ্যাবধি সর্বদাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গ থেকে ভুল-ক্রটি হয়ে আসছে। কিন্তু এসব ভুলের কারণে প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়া হয়নি। বরং সংশোধন করা হয়েছে। ভুল-ক্রটি ছেঁটে ফেলা হয়েছে। তাবলীগ জামাতের লোকেরাও আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং এদের মধ্যেও এমন কিছু নতুন ও অনভিজ্ঞ লোক অবশ্যই রয়েছে যারা সীমারেখা লঙঘন করে বসে। তাই বলে সীমিত কয়েকজনের ভুলের কারণে গোটা জামাতকে অভিযুক্ত করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। দ্বীনী মাদারেসগুলোরও একই অবস্থা। তাই সকলের কাছে অনুরোধ, অনর্থ বিষয় নিয়ে ঘাটা-ঘাটি না করে প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের

চেষ্টা করুন। আল্লাহই সঠিক পথপ্রদর্শক। তিনিই একমাত্র সহায়ক।

(পূর্বসূরীদের কলঙ্ক)

হুসাইন আহমদ (গুফিরা লাহু)

মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব বিজপুরী সাওয়ানেহে ইয়ুসুফীতে লিখেন, অন্যদের কথা জানি না, তবে হযরত মাদানী (রহঃ) সম্পর্কে যতটুকু জানি তা হল, হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) যখনই সাহারানপুর তাশরীফ নিয়ে যেতেন, দেওবন্দ অবশ্যই যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বসে থাকতেন। তাঁর সাথে হযরত মাদানী (রহঃ)-এর এত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, যখনই কোন এজতেমায় শরীক হতেন যারা মুসাফা করতে আসত তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, চিল্লা দেয়া হয়েছে কিনা। নেতিবাচক জবাব দিলে তাকে চিল্লা দেয়ার জন্য নাম লিখাতেন।

হযরত শায়খুল ইসলাম (রহঃ) তাবলীগী বিভিন্ন এজতেমায় অসংখ্য তাকরীর করেছেন। সেসব তাকরীরগুলোর কিছু কিছু প্রকাশিতও হয়েছে যা এত দীর্ঘ যে, এ ক্ষুদ্র পরিসরে সন্নিবেশিত করা সম্ভব নয়। সেগুলোকে ভিন্নভাবে প্রকাশিত করে দিলে মানুষের হিদায়েতের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হত। সেই সাথে তাবলীগ জামাতের সাথে হযরতের গভীর সম্পর্কের বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যেত। অবশ্য "হযরত শায়খুল ইসলাম কী আহাম তাকরীর" (হযরত শায়খুল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বয়ানসমূহ) নামে ছোট্ট একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দু'টি তাকরীর বেশ বিস্তারিত। এখানে আমি দ্বিতীয় তাকরীরটির শেষাংশ উদ্ধৃত করছি। এই তাকরীরটি ২৬ জুলাই ১৯৫৭ ইং-তে জুমুআর নামাযের পর মাদরাজের এক তাবলীগী এজতেমাতে প্রদান করেছিলেন। আরো মজার কাণ্ড, এটাই ছিল হযরতের শেষ সফর এবং শেষ বয়ান। যাহোক, এ বয়ানের শেষের দিকে হযরত বলেন–

ভাইরা আমার! আপনাদের এই সমাবেশ, তাবলীগ জামাতের সমাবেশ। আর এ তাবলীগ ছিল নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল দায়িত্ব। সুতরাং আপনারা যে কাজ করছেন তা অসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী। অতএব এ কাজে নিয়োজিত হওয়ার সৌভাগ্য হওয়া অত্যন্ত সুসংবাদ বাহক।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকই কাজ নেয়ার মালিক। তিনি ইচ্ছা না করলে আপনাদের করার কিছুই ছিল না। ইরশাদ হয়েছে–

و ما تشاءون الا ايشاء الله رب العلمين

তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

আরো ইরশাদ হয়েছে–

يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان ان كنتم صادقين

তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে। আপনি বলে দিন; তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না; বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক।

সত্যি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আপনাদের অন্তরে এ বিষয়টি ঢেলেছেন। এই হিন্দুস্তানেই আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই গুজরে গেছেন, যারা পরস্পরে মারা-মারি কাটা-কাটি আর পার্থিব ধন-দৌলত ছাড়া কিছুই বুঝত না। তাবলীগের কথা স্মরণ করারও সুযোগ তাদের হয়নি। আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে আমাদের যুগের ওলামা কেরাম ও দ্বীনদারদের এই তাওফীক দান করেছেন। আপনারা আল্লাহর বান্দাদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করছেন। কালিমা নামাযের সাথে যাদের আদৌ সম্পর্ক নেই নিঃসন্দেহে তারা জাহান্নামের যোগ্য ছিল। আপনারা তাদের হাতে পায়ে ধরে সোজা পথে ফিরিয়ে আনছেন। আর এক কথায় জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাচ্ছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা উন্নতী দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অবনতি দান করেন।

বাদশাহর খেদমত কর বলে এ কথা ভেব না যে, তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ করছ; বরং তার অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে খেদমতে নিয়োজিত করেছেন।

আল্লাহর শোকর আদায় করুন যে, তিনি আপনাদেরকে এ খেদমত করার

তাওফীক দান করেছেন। অসম্ভব কিছুনা যে, অনেকে আপনাদের কথা উপেক্ষা করবে। আপনারা আর কি; স্বয়ং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই মানুষ উপেক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়; বরং তার সাথে মানুষ অমানবিক আচরণ করেছে। সুতরাং বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। মুর্খ জাহেলরা যদি গালমন্দ করে তবে নীরবে সয়ে যাবেন। এটাই নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য সকল নবীগণের সুন্নত।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لقد اوذيت فى الله و ما اوذى احد مثلى و لقد اخفت فى الله و ما اخيفت احد مثلى الحديث

আল্লাহর পথে আমি এমন কষ্ট পেয়েছি যা আর কেউ পায়নি। আল্লাহর পথে আমাকে এমন ভয় দেখানো হয়েছে যা আর কাউকে দেখানো হয়নি।

আপনাদের এ আন্দোলন যদি সফলকাম নাও হয় এবং একজনও যদি আপনাদের ডাকে সাড়া না দেয় তবুও আপনাদের মেহনত সার্থক, আপনাদের দরজা অনেক উর্ধ্বে এবং আপনারা পুরাপুরি প্রতিদান পাবেন। আর আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে, এ কাজ আল্লাহর দরবারে মকবুল।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আলী (রাঃ)-কে খায়বার জয় করার জন্য প্রেরণ করলেন, হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি সেখানে পৌঁছেই যুদ্ধ শুরু করে দিব? নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না; বরং তোমরা সেখানে পৌঁছে প্রথমে অপেক্ষা করবে এবং লোকদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাহ'র প্রতি আহবান করবে। যদি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয় তখন দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কেননা–

لان يهدى الله بك رجلا خير لك من الدنيا و ما فيها

আল্লাহ পাক তোমার উসীলায় যদি একজন ব্যক্তিকে হিদায়েত দান করেন তবে এটা তোমার জন্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে এসব অপেক্ষা উত্তম। অন্য রিওয়ায়েতে রয়েছে– তোমার জন্য কতগুলো জোয়ান উট লাভ করা অপেক্ষা উত্তম।

ভাইয়েরা আমার! আপনাদের এ পদক্ষেপ অত্যন্ত মুবারক পদক্ষেপ। আল্লাহ আপনাদের চেষ্টা-সাধনার বদৌলতে মানুষকে উপকৃত করুন এবং আপনাদের দ্বারা ইসলামের খেদমত নিন। আপনারা কস্মিনকালেও সংকীর্ণমনা হবেন না। কিছু কষ্ট তো স্বীকার করতে হবেই। যেমন নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সকল আম্বিয়া কেরামকে করতে হয়েছে। আপনারা কি বলতে পারেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তীরোধানের পর সাহাবা কেরাম আরব ছেড়ে ইরাক, ইরান, শিরিয়া, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান, এককথায় সমগ্র বিশ্বের আনাচে-কানাচে কেন ছড়িয়ে পড়েছিলেন? কি উদ্দেশ্য ছিল তাদের? দেশ জয় করা, ধন-দৌলত লুণ্ঠন করা? মোটেই নয়; বরং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লা-ইলাহা ইল্লাহর দাওয়াত দেয়া। দুনিয়ার মানুষকে সঠিক দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বান্দাদের আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেয়া। জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা। অবশ্য পরবর্তী লোকেরা বোকামী করে মুর্খতার বশবর্তী হয়ে দুনিয়া মুখো হয়ে পড়েছিল।

ইতিহাস সাক্ষী, হিন্দুস্তানে বহিরাগত মুসলিম সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ লক্ষ। কিন্তু হিন্দুস্তান বিভক্তির সময় মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ালো দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। আমাদের পূর্বসুরীগণ দ্বীনের দাওয়াতের পিছনে সীমাহীন চেষ্টা করেছেন।

জনৈক ইংরেজ ইসমেথ লিখেন, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিস্তী (রহঃ)-এর হাতে নব্বই লক্ষ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে। আচ্ছা বলুন তো; কি ছিল তাঁর কাছে? কোন সামরিক শক্তি, না অন্য কিছু? কিছুই ছিল না, ছিল শুধু আল্লাহর মা'রেফাত।

সব জায়গায়ই আল্লাহর এমন কিছু বান্দা গুজরেছেন, যাঁরা তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। আমি তুর্কিস্তানের ইতিহাসে পড়েছি, তুর্কি সম্প্রদায়ের তিন লক্ষ পরিবার একদিনে মুসলমান হয়েছিল। আল্লাহর মেহেরবানীতে দাওয়াতের আন্দোলন এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, এক সময় মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য শাসকবর্গকে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল।

১০০ হিজরী সালে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের শাসনামলে খুরাসানের শাসক আশংকা করতে লাগলেন, এভাবে সকলে মুসলমান হয়ে গেলে 'কর' বন্ধ হয়ে রাজ ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি বাধ্য হয়ে ঘোষণা করলেন, খৎনা করা ছাড়া কারো ইসলাম গ্রহণ করা হবে না। এ ঘোষণার পর বয়ঃবৃদ্ধদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। ফলে ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা কমতে লাগল।

খলীফা এ সংবাদ পেয়ে খোরাসানের শাসককে পদচ্যুত করে বললেন, আল্লাহর রাসূল মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আসেননি।

বন্ধুগণ! আমাদের পূর্বসুরী ওলামা কেরাম, আল্লাহওয়ালা ও সাধারণ মুসলমানদের প্রচেষ্টায় দশ কোটি পচিশ লক্ষ লোক মুসলমান হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে যদি লোকেরা বিপথগামী না হত তা হলে হিন্দুস্তানের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যেত।

বন্ধুগণ! আল্লাহ পাক আপনাদের অন্তরে তাবলীগের মহব্বত দান করেছেন, এটি অত্যন্ত মুবারক আমল। আপনারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ আপনাদেরকে আরও অধিক পরিমাণে তাওফীক দান করুন।

বন্ধুগণ! মন ছোট করবেন না। আল্লাহর রহমতের আশা রাখুন। সকল মানুষকে আল্লাহর সন্তুটি ও নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের দিকে আহবান করেন। নিজেও আমল করুন, তাঁর সুরত সীরাত ইখতিয়ার করুন।

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

হযরত শায়খুল ইসলাম (রহঃ) তাবলীগী এজতেমাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছেন, যার সবগুলো সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ। আমার ডাইরীতে খুঁজলেও বহু এজতেমায় হযরতের অংশগ্রহণের কথা মিলবে।

৩রা জুমাদাস্‌সাণী ১৩৭৫ হিঃ মুতাবেক ১৭ জানুয়ারী ১৯৫৬ ইং রোজ মঙ্গলবার পরাহ্নে ডাস্‌নাতে অনুষ্ঠিত এজতেমায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এ এজতেমা সম্পর্কে সাওয়ানেহে ইউসুফীর টীকাতে লিখা হয়েছে যে, এটাই ছিল তাবলীগী এজতেমায় হযরত মাদানী (রঃ)-এর জীবনের শেষ অংশগ্রহণ। মনে

হয় লিখক অনুমান করে লিখে দিয়েছেন। কেননা এর পর তিনি মাত্র এক বছর বেঁচে ছিলেন। আসলে এ তথ্য ঠিক নয়; বরং 'আরকাট'-এর যে এজতেমায় অংশগ্রহণের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে সেটি এরও পরের কথা।

১৯৪৭ ইং-এর গণ্ডগোলের পর যখন নিযামুদ্দীনের ওলামা কেরামের জন্য জলছা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল সেই সঙ্কটময় মুহূর্তেও তিনি তাবলীগী এজতেমাগুলোতে প্রচুর অংশগ্রহণ করেছেন।

সাওয়ানেহে ইউসুফীতে লিখা হয়েছে যে, ইংরেজী ৪৭ সনে পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ ছিল যে, ঘর থেকে বের হওয়াই কঠিন ছিল। বাইরের দিকে পা বাড়ানো মানেই মৃত্যুর মুখে পড়া। সে সময় সকল আপন জন, হীতাকাঙ্খী এমন কি বহু দিনের পুরাতন বন্ধুরাও পাশকেটে গিয়েছিল। যাঁরা মোটামুটি গণ্যমান্য এবং সরকারের উপরও যাঁদের প্রভাব ছিল তাঁরাও নীরব থাকার উপদেশ দিতেন। কিন্তু এ অন্ধকার রাত্রেও কিছু কিছু প্রদীপ প্রজ্জলিত ছিল।

হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ) তো বরাবর মারকায এবং মারকাযওয়ালাদের তত্ত্বাবধান করেন এবং তাঁদের সাহস যোগান। হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেবও যথেষ্ট বিক্রম ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন। (তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত ভিন্নভাবে আলোচনা সামনে আসছে।)

হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব এবং মাওলানা আহমদ সাঈদ সাহেব (রহঃ)ও এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যথেষ্ট সহযোগিতা করতে থাকেন।

তাবলীগ জামাত সম্পর্কে অন্যান্য আকাবিরদের

মন্তব্য ও বাণী

এ কথা অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই যে, হযরত আকদাস শাহ আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরী (রহঃ) নিযামুদ্দীন বহুবার তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন এবং তাবলীগের উদ্দেশ্যে তার বিভিন্ন সফর এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মশওয়ারাগুলোতে অংশগ্রহণের সংখ্যাও প্রচুর। এই অধমের মাধ্যমেই হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর যুগে এবং তার পর হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর যুগে এদের উভয়কে রায়পুর এজতেমা করার জন্য একাধিকবার আহবান করেছেন। হযরতের সময় হযরতের আদেশক্রমে রায়পুরে বহুবার তাবলীগী এজতেমা হয়েছে। অপরপক্ষে হযরত রায়পুরী (রহঃ)ও বহুবার দিল্লী তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন এবং হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) উভয়ের সময় তাঁর সাথে তাবলীগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাশওয়ারা হত। এত ঘন ঘন সাক্ষাত হওয়ার পরও হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর তৃপ্তি হত না। তিনি চাইতেন হযরতের আগমন আরো ঘন ঘন হোক। এ সম্পর্কে আমার 'আপবীতী' ৪র্থ খণ্ডে একটি দীর্ঘ ঘটনা আলোচিত হয়েছে যে–

একবার হযরত দেহলুভী (রহঃ) আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে, হযরত রায়পুরী (রহঃ)-এর আগমন আরও ঘন ঘন হোক। জবাবে হযরত রায়পুরী (রহঃ) অধমের দিকে ইংগিত করে বললেন, আমার আগমন তো এঁর উপর নির্ভর করে। এতে চাচাজান অত্যন্ত গোস্যা হয়ে বললেন, হযরতের আগমন যদি এতই সহজ ছিল তাহলে কেন এত বিলম্ব হয়?

হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে রয়েছে যে, মাওলানার দৃষ্টিতে কোন দেশের অজ্ঞতা, উদাসীনতা, ধর্মানুরাগ শূন্যতা ও অসদস্পৃহা সকল ফিতনা ও অনিষ্টতার উৎস। এর একমাত্র সমাধান হল, মেওয়াতের লোকদের নিজেদের এসলাহ, শিক্ষা ও দ্বীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধির দেয়ার এবং এর জন্য মেহনত করার শক্তি ও জযবা পয়দা করার জন্য বাইরে বিশেষত ইউপির শহরগুলোতে

যাওয়া। এর জন্য সর্বপথম সফর নিজের দেশেই 'নাধলা' অঞ্চলে রমযানে স্থির হল। যার বিস্তারিত বিবরণ হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে রয়েছে।

তার পর দ্বিতীয় সফর নির্ধারিত হল রায়পুরে এবং হযরত নিজেই সকলকে নিয়ে ১০-১১ শাওয়াল রায়পুর গেলেন। বস্তুত রায়পুরও ছিল প্রশান্তির জায়গা এবং দ্বীনী ও রুহানী মারকায। সেই সাথে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম সাহেব (রহঃ)-এর স্থলাভীষিক্ত হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেবের পক্ষ থেকেও বেশ উদারতা ও হৃদ্যতা ছিল। (সাওয়ানেহে দেহলুভী)

এখান থেকেই মেওয়াতের জামাতগুলোর ইউপিতে আগমন অরম্ভ হয় এবং একাধিকবার রায়পুরে এজতেমা হয়। হযরত রায়পুরী (রহঃ)ও 'বাগ' অঞ্চলের তাঁর সকল ভক্ত ও অনুরক্তদের এজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ গুরুত্বের সাথে পাঠাতে থাকেন। এই অধমও রায়পুরের বিভিন্ন এজতেমাতে অংশগ্রহণ করেছে।

সাওয়ানেহে ইউসুফীতে রয়েছে যে, হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) হিন্দুস্তান বিভক্তির ভয়াবহ পরিস্থিতির সময় এমন এক জায়গা থেকে এজতেমা করা আরম্ভ করলেন, যেখানে গোড়া থেকেই যিকিরের পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং বহু বছর ধরে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ধ্বনি হচ্ছিল এবং এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের ছায়া বিরাজ করছিল যিনি বহু বছর ধরে ঈমান-ইয়াকীন ও যিকরে এলাহীর সবক দিচ্ছিলেন। হিন্দুস্তান বিভক্তির পর সর্বপ্রথম এজতেমা রায়পুরে অনুষ্ঠিত হয়।

তারা রবীউছ্ছানী ৬৭ হিজরী মুতাবেক ১৪ ফেব্রুয়ারী ৪৮ ইংরেজী দিবাগত রাত্রে হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) সাহারানপুর গমন করেন। আর এদিকে লখনৌ থেকে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী ও মাওলানা মুহাম্মদ মঞ্জুর নু'মানী পাঞ্জাব মেইলে সাহারানপুর পৌঁছেন।

পর দিন সকালে এরা সকলে রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রায়পুর এক বিরাট এজতেমা ছিল। এ সম্পর্কে রবিবার দিবাগত রাত্রে জামে মসজিদে একটি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আর এ জলসাটি ছিল একটি সার্থক বুনিয়াদি জলসা। এখান থেকেই পরবর্তী এজতেমা ও জলসাগুলোর পথ সুগম হয়। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে এসে যারা রায়পুর অশ্রয় নিয়েছিল তারাও এই এজতেমায়

অংশগ্রহণ করে। এই সফরেই হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহঃ) মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-কে পাকিস্তান ঘুরে আসার জোর তাগিদ করেন।

রায়পুরের দ্বিতীয় এজতেমা আকস্মিকভাবে হয়েছিল। প্রথম থেকে কোন এন্তেজাম ছিল না। হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) হযরত রায়পুরী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। এ আসার প্রোগ্রামও আকস্মিক হয়। সাহারানপুরের অন্তর্গত ফায়সালাবাদের লোকেরা বেশ কিছু দিন যাবত হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেবকে তাদের সেখানে নেয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু হযরতের সফরের কষ্টের কথা ভেবে হযরত রায়পুরী (রহঃ) সেখানে যাওয়ার মত দেননি; বরং তাদেরকে বললেন, তোমরা রায়পুর এসে হযরত শায়েখের ফয়য হাসিল কর। এদিকে ১৬ মুহাররাম ১৩৭৩ হিজরী রোজ শনিবার হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব অন্যান্য সাথী সঙ্গীসহ সাহারানপুর আগমন করেন। এখানে এসে হযরত শায়খকে না পেয়ে তৎক্ষনাৎ রায়পুর তাশরীফ নিয়ে যান। এভাবেই আকস্মিকভাবে সকল মহতিরা সমবেত হন।

হযরত রায়পুরী (রহঃ) এ সুবর্ণ সুযোগকে হাতছাড়া না করে আশে-পাশের সকলকে লোক পাঠিয়ে সমবেত করার এবং বুধবার সকালে জামে মসজিদে একটি তাবলীগী এজতেমার এন্তেজাম করার নির্দেশ দিলেন। হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) আপত্তি করে বললেন, হযরত আমি তো শুধু দেখা করতে এসেছি কিন্তু হযরত রায়পুরী (রহঃ) মানলেন না। ফলে হযরত মাওলানাও রাজি হয়ে গেলেন।

যাহোক, বুধবার সকাল রায়পুর জামে মসজিদে প্রায় ছয় ঘন্টার এজতেমা হল। এজতেমাও অত্যন্ত সার্থক হল। মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত শায়খুল হাদীছের আগমনের সংবাদ পেয়ে আশে-পাশের বিপুল সংখ্যক লোক সমবেত হল। হযরত মাওলানা দীর্ঘ চার ঘন্টা বয়ান করলেন এবং বয়ানের পর দু' ঘন্টা তাশকীল হল। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

হযরত রায়পুরী (রহঃ), হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এঁদের তিনজনের জীবনীতে লক্ষ্য করলে উভয় হযরতের হযরত রায়পুরী (রহঃ)-এর খেদমতে একাধিক বার উপস্থিতি এবং বিভিন্ন এজতেমার আলোচনা মিলবে। অপর পক্ষে হযরত রায়পুরী (রহঃ)-এরও হযরত দেহলুভী (রহঃ)-সময়

দিল্লীতে এবং হযরত মাওলানা ইউসুফ (রঃ)-এর সময় নিযামুদ্দীন আগমন করা এবং কয়েকদিন করে অবস্থান করা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মশওয়ারা সমূহের আলোচনা মিলবে।

'গিলালতা'র এজতেমাটি ছিল হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর এন্তেকালের পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এজতেমা। তাই হযরত রায়পুরী (রহঃ) এতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অংশগ্রহণ করেন। হযরত ইউসুফ (রহঃ)-এর জীবনীতে এ এজতেমার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে, মুরাদাবাদ থেকে সত্তর জন এজতেমা অংশগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আনন্দ উৎসাহের সাথে পদব্রজ চলে আসেন। এমন কি তাদের কোন ক্লান্তই অনুভব হয়নি। অন্য দিকে সাহারানপুর থেকে হযরত শায়খুল হাদীছ এবং রায়পুর থেকে হযরত রায়পুরী (রহঃ) ২৯ শাউয়াল নিযামুদ্দীন পৌছেন। এঁরা উভয়ে এজতেমার দিন অর্থাৎ রবিবার নিযামুদ্দীন থেকে 'গিলালতাহ' পৌঁছেন।

সাহারানপুরের অন্তর্গত জওয়ালাপুরের এজতেমার তো হযরত রায়পুরীর অনুরোধেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ 'সাওয়ানেহে ইউসুফী'তে রয়েছে।

(খ) হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা ওসিউল্লাহ সাহেবের এক চিঠির আংশিক হযরত হাকীমুল উম্মতের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল। পূর্ণ চিঠিটি নিম্নরূপঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

এ ধরনের প্রশ্নের জবাব আগেও দেওয়া হয়েছে। এখন আপনিও লিখে পাঠিয়েছেন, তবে আপনার পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন বিস্ময়কর বিষয়। এই তাবলীগ জামাত আজ নতুন বিষয় নয়। এর উপর এক যুগ পার হয়ে গিয়েছে। এখন এ জামাত উন্নতীর পথে। ওলামা কেরামও অংশগ্রহণ করছেন। তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তা এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অবস্থান বিবেচনা করেই অংশগ্রহণ করছেন। আর এটি দিবালোকের মত পরিষ্কার। তারপর কোন প্রকার প্রশ্নের অবতারণা তাও আমার মত মানুষের কাছে কোনই প্রয়োজন থাকে না।

কাজ করাই হল আসল উদ্দেশ্য আর তা করতে হবে শরীয়ত সম্মত পন্থায়। ওলামা কেরাম উভয় দিক সম্পর্কেই অবগত রয়েছেন। সুতরাং যারা তাঁদের তাকলীদ করা আবশ্যক মনে করছেন তাঁদের জন্য তাকলীদ করা আবশ্যক। বলাবাহুল্য, মানুষ কোন কাজ করার পূর্বেই শরীয়তের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব ও অবস্থান কি তা বিবেচনা করেই কাজ আরম্ভ করে। আর এতেও এ দু'টি দিক দেখে শুনে নেয়া হয়েছে। এখন আর প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন তো হয় কাজের পূর্বে; সুতরাং এখন তো প্রশ্ন নিরর্থক। এখন তাবলীগ জামাত উন্নতীর পথে এবং দিন দিন উন্নতী বৃদ্ধিই পাচ্ছে। যারা এ জামাতের পক্ষে রয়েছেন তাদের ইখলাসের সাথে কাজ করে যাওয়া উচিত। প্রশ্ন করার অর্থ তো এখনও এ বিষয়ে দ্বিধা রয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে প্রশ্ন করব, তবে কি এর জায়েয-নাজায়েয নিয়ে দ্বিধা? না সকলকে এতে শরীক করার ইচ্ছা? জরুরী কাজ তো অনেক। আর সবগুলোই করতে হবে। এ কাজের জন্যও একটি জামাত হওয়া জরুরী। আর শরীয়তের সীমারেখার প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক জামাতের জন্য আবশ্যক। ওয়াস্‌সালাম।

ওসীউল্লাহ (উফিয়া আনহু)

(চশমায়ে আফতাব)

হযরত মাওলানা ওসীউল্লাহ সাহেবের বিশেষ খলীফা এবং তাঁর খানকা থেকে প্রকাশিত 'মা'রিফাতে হক' সাময়িকীর সম্পাদক ডঃ সালাহ আহমদ সাহেবের জামাতা জনাব শামসুর রহমান সাহেবের একটি পত্র এসেছে আমার কাছে। তাতে তিনি তার নিজের সপ্তাহিক দুই গাশ্‌ত করা, মারকাযে শবগুজারী, ফজরের পর তা'লীম ও সপ্তাহিক একটি বয়ান নিজের দায়িত্বে হওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন তাবলীগী তৎপরতার কথা বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, আমার এসব তৎপরতার ব্যাপারে ডঃ সাহেব কোন সময় বাধা প্রদান তো করেননি উপরন্তু মাঝে মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলেছেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল এবং এটি আমাদেরই কাজ।

আল্লাহ পাক ডঃ সাহেবকে এই উত্তম তত্ত্বাবধানের জন্য উভয় জাহানের উত্তম জাযা দান করুন এবং তার জামাতার সকল মেহনতের সওয়াবের এক অংশ তাকেও দান করুন। আর এসব নেকের সমষ্টি হযরত মাওলানা ওসীউল্লাহ

সাহেবকেও দান করুন। কেননা এ সবই তাঁর নেক নযরের ফলাফল।

(গ) হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর খলীফা ও মাদ্রাসা মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুরের নাযিম মাওলানা আসআদুল্লাহ সাহেবের পত্রঃ

শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা!

ওয়ালাইকুমুস্‌ সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

কয়েক দিন হল আপনার জবাবী চিঠি পেয়েছি। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর তাবলীগী আন্দোলন সম্পর্কে থানুভী (রহঃ)-এর বিরোধীতার ব্যাপারে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এ বিষয়ে বহু চিন্তা-ভাবনা করার পর এবং এ বিষয়ে আমার যা জানা রয়েছে তা সব স্মরণ করার পর আপনার চিঠির জবাব লিখার জন্য মুহাম্মদউল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছি।

আমার জানা মতে এবং আমার সামনে হযরত থানুভী (রহঃ) কাউকে তাবলীগ করতে নিষেধ করনেনি। মাত্র কয়েক দিনের কথা, হযরত মুফতী শফী (রহঃ) তাবলীগ জামাতের জবরদস্ত কর্মী মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবকে তাঁর ওখানে তাবলীগী বয়ান করিয়েছেন। হযরত মুফতী সাহেব নিজের ওখানে বরাবর কাজ করে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বহু ভক্ত-অনুরক্ত সক্রিয়ভাবে তাবলীগে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হল, আমি এতে অংশ গ্রহণ করা নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি; যদিও বিভিন্ন ব্যাস্ততার কারণে তেমন একটা সম্ভব হয়ে উঠে না। তারপরও সময়ে সুযোগে তাবলীগের বিভিন্ন এজতেমায় অংশগ্রহণ করে থাকি।

আজ থেকে চার পাঁচ বছর পূর্বের কথা; সাহারানপুরের জামে মসজিদে প্রতি বৃহস্পতিবার সপ্তাহিক এজতেমায় রীতিমত অংশগ্রহণ করতাম। শুধু তাই নয়; বরং আমার সকল জাহেরী ও বাতেনী বন্ধু-বান্ধবদের এ দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য নির্দেশ করে থাকি। যারা আমার কাছে বাইআত গ্রহণ করে তাদেরকেও তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে তাগিদ করে থাকি।

আর এ কথা বাস্তব সত্য যে, আমাদের হযরতের (থানুভীর) এখানে বরাবর তাবলীগের কাজ হয়ে এসেছে। কোন বিশেষ মুবাল্লিগ সম্পর্কে হয়ত কোন সময়

সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাবলীগের উপর আমার জানা মতে কখনও সমালোচনা করেননি।

অপর পক্ষে আমি নিজেও যতটুকু এই জামাতকে পর্যালোচনা করেছি তাতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ যুগে সুন্নাতে রাসূল মতে জীবন যাপনের জন্য এ তাবলীগ জামাতই একমাত্র পথ। এরপর এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

বাস্তব কথা এই যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাবলীগের অপরিহার্যতা সন্দেহাতীত এবং এর উপকারিতাও দিবালোকের মত পরিষ্কার। আল্লাহ পাকের নির্দেশে আম্বিয়া কেরাম তাবলীগ করেছেন। তাদের পর সাহাবা কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, ওলামা, আওলিয়া ও সুফিয়া কেরাম বরাবর তাবলীগ করে এসেছেন।

আশা করি বরং দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আপনাকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি এবং আপনার মনে আর কোন দ্বিধা নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাবলীগ জামাত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং এর সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন।

হযরত শায়েখের কাছে শুনেছি যে, হযরত ফুলপুরী (রহঃ) তাবলীগের জবরদস্ত সমর্থক ছিলেন। হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেব তো কোমর বেঁধে এ তাবলীগী আন্দোলনের সমর্থন করেছেন। সেই সাথে দাওরার হযরত মাওলানা আমীর আহমদ সাহেব, মুফতী মুযাফ্ফর হুসাঈন সাহেব সহ অন্যান্য সকল আসাতেজা কেরাম সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করে আসছেন।

এ কথাও বাস্তব সত্য যে, গোটা মাযাহেরুল উলূমকে তাবলীগের মারকায ও ঘাঁটি বলা চলে। এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা, সমর্থক, পৃষ্ঠপোষক সকলেই মাযাহেরুল উলূমের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হযরত শায়েখ মুবাল্লেগীনদের দাওয়াত ইত্যাদিতে প্রতি মাসে উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় করেন।

মুহাম্মদ আসআদুল্লাহ

লিপিবদ্ধ করণে মুহাম্মদ উল্লাহ

(ঘ) হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা ও দারুল

উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার মহা পরিচালক হযরত মাওলানা আল-হাজ কারী মুহাম্মদ তায়্যিব সাহেব তাবলীগ জামাতে এত প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছেন যা গুণে শেষ করার মত নয়।

হযরত কারী সাহেবের কয়েকটি বয়ান "কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হায়" নামক পুস্তিকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত কারী সাহেবের তাবলীগী সফরগুলো সংগ্রহ করতে চাইলে "রিসালা দারুল উলূম' যথেষ্ট। মেওয়াতের বিভিন্ন এজতেমায় হযরত কারী সাহেবের সাথে এ অধমও ছিল। সাহারানপুরের বার্ষিক এজতেমাতে তো হযরত কারী সাহেব সব সময়ই অংশগ্রহণ করতেন এবং তাবলীগ জামাতের সমর্থনে এবং তাবলীগে অংশগ্রহণ করার জন্য জোর তাগিদ দিয়ে একাধারে কয়েক ঘন্টা তাকরীর করতেন। এটা তো আমার নিজের দেখা।

হযরত কারী সাহেবের ভোপালের এজতেমায় বয়ান করা একটি তাকরীর মৌলভী মুহাম্মদ আহসান নদভী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং নিশান মঞ্জিল থেকে তা প্রকাশিতও হয়েছিল। জনাব আল-হাজ ইব্রাহীম ইউসুফ রাওয়া সাহেব কর্তৃক রচিত "হাকীকতে তাবলীগ"-এও সেটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ বয়ানে কারী সাহেব বলেন–

কয়েক বছর হল, হিন্দুস্তানে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) দাওয়াত ও তাবলীগের এ আন্দোলন শুরু করেছেন। আর এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই তার অন্তরে 'এলকা' করা (ঢালা) হয়েছে। তিনি তাবলীগের জন্য জামাত সমূহের পথ অবলম্বন করেছেন। আর মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) জামাতী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

সম্ভবত আমি কোথাও লিখেছি যে, এ তাবলীগ আল্লাহ পাক হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর অন্তরে একটি বিশেষ 'ফন' স্বরূপ ঢেলেছেন। এতে একদিকে যেমন রয়েছে শিক্ষা-দীক্ষা তেমনি রয়েছে আত্মিক প্রশান্তি, ভ্রমণ ও পর্যটন এবং শরীর চর্চা। আজকের যুগে এ কাজ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও প্রয়োজনীয়। এ জন্যই এ কাজের অগ্রগতি এত দ্রুত পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই নীরব তাবলীগের মাধ্যমে এক বিরাট বিপ্লব আসছে। হিন্দুস্তানের যে কোন অঞ্চলে এবং হিন্দুস্তানের বাহিরেও যেসব জায়গায় আমি গিয়েছি সেখানেই

তাবলীগ জামাত এবং তাবলীগী মারকায দেখেছি। সাধারণ পদ্ধতিতে বিশ্বব্যাপী এ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। এতে নেই কোন ফিতনা-ফ্যাসাদ, হৈ-হুল্লা। এমন কেউ শুনেনি যে, কোথাও কোন জামাত বিদ্রোহ করেছে কিংবা অনর্থ সৃষ্টি করেছে। এটি একটি নীরব আন্দোলন যা গোটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে যাচ্ছে। এর মকবুলিয়াত ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। তাবলীগের এ কাজে মানুষকে ঘরের পরিবেশ থেকে বের করে আল্লাহর ঘরের পরিবেশে নিয়ে আসা হয়, যে পরিবেশ ঘরের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে এসে মানুষ দায়ী হওয়ার সাথে সাথে আমলদারও বনতে আরম্ভ করে। দায়ী হয়ে আসে আর আমলদার হয়ে ফিরে যায়।

আজকের দুনিয়ায় বহু আন্দোলন চলছে কিন্তু এ আন্দোলন একটি অনন্য আন্দোলন, যার কোন তুলনা নেই। এতে না রয়েছে কোন পদ, না কোন কুরসী, না কোন মসনদ; বরং এখানে নিজের জান, নিজের মাল ব্যয় করতে হয়। এ যুগে দ্বীনের হেফাযতের জন্য এ আন্দোলন একটি সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল। আজকের দুনিয়ায় মুসলমানদের জন্য দু'টি আশ্রয় স্থল রয়েছে– একটি হল, দ্বীনী মাদারেস তথা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ। দ্বিতীয়টি হল, এই তাবলীগ জামাত।

কারী সাহেবের ৪৪ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ ওয়ায "কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হায়" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে কারী সাহেব বেশ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তারপর ইরশাদ করেছেন, এ দীর্ঘ ওয়াযের সারমর্ম হল, এসলাহে নফসের মোট চারটি পদ্ধতি রয়েছে, যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। আর পদ্ধতি চারটির প্রায় সব কয়টিই এই জামাতে রয়েছে। যে যতটুকু মেহনত করবে সে ততটুকুই উন্নতী হাসীল করবে। কেননা আপনি আমল করলে ফলাফল অবশ্যই পাবেন।

এ যাবত সমালোচকদের জবাব আমি ইতিবাচক পদ্ধতিতে দিয়ে এসেছি। অর্থাৎ তাদের সমালোচনা স্বীকার করে জবাব দিয়ে এসেছি। বস্তুত একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে তাদের এ সমালোচনা দৃষ্টিপাত করারই যোগ্য নয়। কেননা, এ জামাতে এক দিকে যেমন রয়েছে প্রবীন প্রবীন অনেক সাথী, যাঁদের থেকে ইচ্ছা করলে এ কাজের উসূল জানা যেতে পারে, আর উসূল মতে কাজ করলে উন্নতী অনিবার্য; অন্য দিকে রয়েছেন অনেক মাদ্রাসার শিক্ষক ও মুফতী

সাহেবান, যাঁদের থেকে ইচ্ছা করলে ইলমও হাসিল করা যেতে পারে এবং মাসআলাও জানা যেতে পারে। তবে এসব অনুকূল পরিবেশ কার জন্য? যারা কাজ করে তাদের জন্য। অপর পক্ষে কাজ যারা না করে তাদের জন্যই যতসব প্রশ্ন।

যাহোক এ নমুনা অত্যন্ত পরিপূর্ণ। অবশ্য মনে না চাইলে ভিন্ন কথা। কথিত আছে, তুমি নিজেই যদি ইচ্ছা না কর তবে বাহানা হাজারো হতে পারে। যাদের বলার ছিল তারা বলে দিয়েছে। ঘোষণাকারীরা ঘোষণা করে দিয়েছে, গন্তব্য স্থলও জানিয়ে দিয়েছে এবং ফলাফল কি হবে তাও বাতলে দিয়েছে। এখন আর তাদের দায়িত্ব নয় কারো দিকে এগিয়ে আসা। কেউ অগ্রসর হয়ে কাজ করলে সে ফল পাবে।

বলাবাহুল্য যে, এর ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুতরাং সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত। তালী'ম, গাস্ত, সময় লাগানো যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব অংশগ্রহণ করা উচিত।

সত্যি বলতে কি, এ কাজ থেকে দূরে থাকা মাহরূমীই বটে। সুতরাং মানসিকভাবে, কার্যত যে কোন পর্যায়েই হোক এতে অংশগ্রহণ করা উচিত।

(ঙ) হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলইমান নদভী (রহঃ) লখনৌ অবস্থানকালে অনুরূপভাবে ভোপাল ও পাকিস্তান অবস্থানকালেও তাবলীগী এজতেমাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা মদীনার এজতেমাগুলোতেও তিনি অংশগ্রহণ ও বয়ান করেন।

মাওলানা আলী মিয়া রচিত হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে সৈয়দ সুলায়মান নদভী সাহেব একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন, যার সম্পর্কে তাযকেরায়ে সুলায়মানে বলা হয়েছে যে, সারগর্ভ এই শীর্ষক ভূমিকাটির কোন তুলনা নেই।

মাত্র বিশ পৃষ্ঠায় লিখা এই নিবন্ধটিতে যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন তার কিছুটা মুল্যায়ন করা যাবে এর শিরোনামগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে। যেমন, (১) মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব (২) রাজ্যক্ষমতা মুখ্য উদ্দেশ্য নয় (৩) মুসলিম উম্মাহ নবীর স্থলাবর্তী (৪) শিক্ষা ও দীক্ষার সমন্বয় (৫) শিক্ষা ও দীক্ষার বিভাজন (৬) শিক্ষা ও দীক্ষার ঐক্যেই সফলতা (৭)

নবুওয়তি ভাবধারাই উম্মতের জীবনধারা (৮) আমাদের আলোচিত বক্তব্য এ মাপকাঠিতে (৯) ওয়ালিউল্লাহী খান্দান (১০) আলোচিত ব্যক্তির বংশসূত্র (১১) সমকালীন তাবলীগী মেহনতের ব্যর্থতা ও কারণ (১১) দাওয়াত ও তাবলীগের নববী নীতি। (তাযকেরায়ে সুলাইমান)

এই তো হল, মোটামুটি বিষয়বস্তু। এতে তিনি "আমাদের আলোচিত ব্যক্তি এ মাপকাঠিতে" শিরোনামের শুরুতে লিখেন, আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে যে মহান দা'ঈ ও তাঁর দাওয়াতি মেহনতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; আমার দু'চোখের সৌভাগ্য এই যে, আমি তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর নূরাণী চেহারার প্রতিটি ভাবরেখা, তাঁর ঘর-বাহিরের বিভিন্ন গতিবিধি ও আচরণধারা এবং তাঁর ভিতরের দরদ ও অন্তর্জ্বালা বারবার আমি দেখেছি, শুনেছি এবং কাছে থেকে অনুভব করেছি। কপালে যাদের এ সৌভাগ্য জুটেনি তারা সজাগ অনুভূতি ও উপলব্ধির সাথে এ বইটি পড়ুন; এ সব ক'টি বিষয় আপনার সামনে বেশ পরিস্ফুট হবে। সেই সাথে দাওয়াতের উছূল ও কর্মপন্থা এবং দাওয়াতের হাকীকত ও সারবত্তা পূর্ণ হৃদয়ংগম হবে।

আর "দাওয়াত ও তাবলীগে নববী নীতি" শিরোনামের অধিনে লিখেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিতে দাওয়াত ও তাবলীগের যে সকল মূলনীতি বিশিষ্টতা লাভ করেছে তন্মধ্যে একটি হলো, 'দাওয়াত নিবেদন'। অর্থাৎ মানুষের আগমন প্রতিক্ষায় বসে না থেকে তিনি ও তাঁর প্রেরিতগণ দূরদূরান্তের বস্তিতে মানুষের দুয়ারে হাজির হতেন এবং সত্যের দাওয়াত পেশ করতেন। এভাবেই আল্লাহর রাসূল মক্কা থেকে সেই 'পাথর খাওয়া' তায়েফে সফর করেছেন এবং নেতৃস্থানীয়দের ঘরে ঘরে তাবলীগ করেছেন। হজ্জ মৌসুমে আগত প্রতিটি গোত্রের কাফেলায় গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং মানুষের উপহাস পরিহাস উপেক্ষা করে তাদের সামনে হকের পায়গাম তুলে ধরেছেন। মানুষের সন্ধানে মানুষের দুয়ারে ধরনা দেয়ার এ নববী-কোরবানীর পথ ধরেই এক সময় সেই মহাভাগ্যবান ইয়াছরাবীদের (ইয়াছরিব বা মদীনার অধিবাসী) দেখা পাওয়া গেলো, যাদের মাধ্যমে 'ঈমান-সম্পদ' মক্কা হতে মদীনায় স্থানান্তরিত হলো।

হোদায়বিয়া সন্ধির পরে শান্তি ও স্বস্তিকালীন সময়ের সুযোগে মুসলিম

দূতগণ ইসলামের বার্তা নিয়ে মিশর, ইরান ও হাবশার রাজদরবারে পৌঁছেছিলেন এবং ওমান, ইয়ামান, বাহরাইন ও সিরীয়া সীমান্তের সরদারদের মজলিসে হাজির হয়েছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন ছাহাবী আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে গিয়ে ইসলামের তাবলীগ করেছেন। হযরত মুছআব বিন ওমায়ের (রাঃ) গিয়েছেন মদীনায় এবং হযরত আলী ও মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) গমন করেছেন ইয়ামান অভিমূখে। যুগে যুগে দেশে দেশে ওলামায়ে হক ও আইম্মায়ে দ্বীনের এটাই ছিলো অনুসৃত পন্থা।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, হকের পায়গাম পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর বান্দাদের দুয়ারে গিয়ে হাজির হওয়া দা'ঈ ও মুবাল্লিগের নিজস্ব কর্তব্য।

খানকার স্থির বাসিন্দাদের বর্তমান আচরণ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, হকপন্থী এই সাধক পুরুষদের কর্মনীতি সবসময় বুঝি এমনই ছিলো। এ ধারণা আগাগোড়া ভুল। তাঁদের জীবন-কাহিনী পড়ে দেখুন; কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা? কোথায় আধ্যাত্মিক ফয়েয লাভ করেছেন? তারপর কোথায় কোথায় গিয়ে সত্যের আলো ও হিদায়াতের নূর ছড়িয়েছেন? আর শেষ বিশ্রামের জন্য কোথায় গিয়ে মাটির আশ্রয় পেয়েছেন? এই 'সফরি-জিহাদ' তারা এমন এক সময় করেছিলেন যখন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব ছিলো না। রেল-বিমানের গতিও ছিলো না মানুষের কল্পনায়। তাই "ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী" বলার মতো গর্ব ছিল না তাদের।

আজমীরের হযরত মঈনুদ্দীন চিশতির জন্ম সীস্তানে। আধ্যাত্মিক সাধনা আফগানিস্তানে আর সত্য প্রচার করেছেন রাজপুতানার কুফুরস্তানে। হযরত ফরীদ শোকরগঞ্জ সিন্ধুর উপকূল পথে দিল্লী হতে পাঞ্জাব চলাচল করেছেন। তাঁর শিষ্য উপশিষ্যদের মধ্যে সুলতানুল আওলিয়া হযরত নিযামুদ্দীনের এবং পরবর্তীতে তাঁর খলীফাদের জীবন-কথা পড়ুন। সফরের পথ পরিক্রমা লক্ষ্য করুন। আর মানচিত্র খুলে দেখুন, কোন দূর দূরান্তে ছড়িয়ে আছে তাঁদের মাজার। কেউ দক্ষিণাত্যে, কেউ মালয়ে, কেউ বাংলাদেশের দূর পাড়াগাঁয়ে। কেউ বা যুক্তপ্রদেশের অখ্যাত কোন এলাকায়।

সৈয়দ সুলাইমান নদভী তাঁর একটি চিঠিতে লিখেন,

ভোপাল হতে, ১লা জিলহজ্জ ১৩৬৮ হিঃ

প্রিয় (আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন)!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

মক্কী জীবন থেকে মাদানী জীবন সফলকাম হওয়া দুষ্করই বটে। আর অতীতের ঘুনে খাওয়া সমাজ ব্যবস্থার উপর নতুন দেয়াল নির্মাণ অসম্ভবই বটে। নিজে মুসলমান রূপে দাঁড়িয়ে উঠা, অন্য মুসলমানদের প্রকৃত মুসলমান রূপে গড়ে তোলা সময়ের গুরু দায়িত্ব। আর এ গুরু দায়িত্বের প্রতি অবজ্ঞা করার পরিবর্তে মহব্বতের সাথে তা আঞ্জাম দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

(তাযকেরায়ে সুলায়মান)

সৈয়দ সাহেবের এই জীবনী-গ্রন্থের আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর তাবলীগ জামাতের একটি বড় মারকায ভোপালেও ছিল এবং বিভিন্ন কারণে তাবলীগের সাথীদের হযরতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাই তার ভোপাল অবস্থানকালে তাবলীগের যাবতীয় কাজের এক রকম তিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর অনেকটা তার নির্দেশেই মাওলানা আশফাকুর রহমান সাহেব কান্‌ধলভী অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং দ্বীনের স্বচ্ছ দাওয়াত নিয়ে পৌঁছে যান দেশের আনাচে-কানাচে।

তার জীবনী গ্রন্থকার অন্যত্র লিখেন, একদিন অর্থাৎ হযরতের মৃত্যুর মাত্র চার দিন পূর্বে মাগরিবের নামাযান্তে যথারীতি খাটে শুয়ে পড়েন। এমন সময় সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত তার কতক সাথী সঙ্গী নিয়ে হযরতের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। অতঃপর দূত তাবলীগ জামাত সম্পর্কে হযরতের ব্যক্তিগত মত জানতে চাইলে তিনি ইরশাদ করলেন, তাবলীগ জামাত হল, স্বচ্ছ দ্বীনের দা'য়ী।

(তাযকেরায়ে সুলাইমান)

মাওলানা আল-হাজ্জ আলী মিয়া সাহেব হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর লখনৌ সফরের বৃত্তান্ত পেশ করতে গিয়ে লিখেন, সৈয়দ সুলাইমান নদভী একদিন আগেই লখনৌ পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং মাওলানার সাথেই অবস্থানরত

ছিলেন। এর কয়েক ঘন্টা পূর্বে সৈয়দ সাহেবের থানাভুনের ষ্টেশনে এবং থানাভুন থেকে কান্‌ধলা পর্যন্ত ট্রেণে মাওলানার সাথে সংলাপের সুযোগ হয় এবং পরের দিন 'ফাটিক হাবশ খান'-এর জলসায় মাওলানার দাওয়াতের বিশ্লেষণ এবং নিজের মতামত পেশ করেন। এ সময় আট/নয় দিন দিবারাত্রি মাওলানার সাথে থাকেন। শেষ দিন জুমুআর দিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যদিয়ে 'আমীরুদ্দৌলাহ ইসলামিয়া কলেজে' তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে এক বিশাল জন সমাবেশ তাঁর অপেক্ষা করছিল। মাওলানা সুলাইমান নদভী সেখানে অত্যন্ত ভাবপূর্ণ এক বয়ান করেন। তাঁরপর মাওলানা ইরশাদ করেন .....

(দ্বীনী দাওয়াত)

(হযরত শায়খুল হাদীছ বলেন,) এ অধমও নদওয়াতুল ওলামায় হযরত দেহলুভীর সাথে ছিল। সৈয়দ সাহেব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে হযরত দেহলুভীর বয়ানে এবং এজতেমাগুলোতে অত্যন্ত শান্ত ও গাম্ভীর্যতার সাথে হাযির হতেন এবং মনোযোগ সহকারে তার বয়ান ও বাণী শুনতেন।

একবার আমার সামনেই তিনি হযরত দেহলুভী (রহঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আপনার কথা শুনলে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর কথা সমূহের স্মরণ জেগে উঠে।

সাওয়ানেহে ইউসুফীতে লিখা রয়েছে, ১৯৪৯ ইংরেজী সালে মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রহঃ) হজ্জের সফরে গমন করেন। মাওলানার সাথে আরবের ওলামা কেরাম আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। এদিকে তাবলীগী সাথীরাও তাঁর আগমনের বেশ কদর করে এবং কয়েকটি এজতেমার ব্যবস্থা করে। এ এজতেমাগুলোতে হিজায, ইয়ামান, শিরিয়া ও ইরাক ছাড়াও মিসর, মরক্কো, টিউনিস এর অসংখ্য ওলামা কেরামও অংশগ্রহণ করেন। প্রথম এজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে। এই এজতেমায় সৈয়দ সাহেবের শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন; মিসর, সুদান, মরক্কো, টিউনিসের শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরাম ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। সৈয়দ সুলাইমান নদভী অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ও জ্ঞানগর্ভ ভঙ্গিতে দাওয়াত তাবলীগ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এজতেমার শেষে সকলেই নিজ নিজ ঠিকানা প্রদান করেন এবং এ কাজের প্রশংসা করেন। সেই সাথে এ কাজের সাথে

নিজেদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেন। (সাওয়ানেহ)

রায়পুরের প্রধান মুফতী জয়নুল আবেদীন সাহেব এ হজ্জের সফরের বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে তার এক চিঠিতে লিখেন,

১৯৪৯ ইংরেজী সালে সৈয়দ সুলাইমান নদভী সাহেব হিন্দুস্তান থেকে হিজাযে তাশরীফ আনেন। তখন আমরা বরাবর তিন দিন মক্কা শরীফে তার সাথে সাক্ষাত করতে যাই। তৃতীয় দিন তিনি আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি আরয করলাম, আমি পাঞ্জাবের অধিবাসী। ডাভীলে হযরত উছমানী সাহেবের কাছে দাওরা পড়েছি। 'আমর তিসরে' পড়াচ্ছিলাম। তারপর সাত চিল্লা লাগিয়ে এক বছর নিযামুদ্দীনে কাটিয়েছি। সেখান থেকে মুরুব্বীরা ১৯৪৭ ইংরেজী সালে এখানে পাঠিয়েছেন। এখন এখানেই হেজাযে এবং অবশিষ্ট সময় আরবদের মাঝে কাজ করি। ইরশাদ করলেন, বোম্বাই থাকতেই তোমার নাম শুনে এসেছি এবং এও শুনেছি যে, তুমি এখানকার আমীর। আমি আরয করলাম, জি হুযুর! মুরুব্বীরা আমাকেই আমীর বানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করলেন, আমার এখানকার সময় সম্পূর্ণ তোমার হাতে সঁপে দিলাম। আমি নিজে থেকে এখানকার কোন প্রোগ্রাম বানাবো না।

এরপর এ কথায় তিনি এত অনঢ় ছিলেন যে, একদিন আমি মাদ্রাসায় সুলতীয়ায় শুয়ে ছিলাম। এমন সময় এক সাথী এসে বলল, হিজাযের শায়খুল ইসলাম শায়েখ আবদুল্লাহ বিন হাসানের ভাই নজদের 'আমর বিল মারূফের' প্রধান শায়েখ ওমর বিন হাসান এসেছেন। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে পড়লাম এবং বাইরে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তারপর তাঁকে ভিতরে নিয়ে এলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, সৈয়দ সুলাইমান নদভীকে আমার বাড়ীতে দাওয়াত করেছিলাম। তিনি নাকি তাঁর এখানকার সময় তাবলীগে দিয়ে দিয়েছেন। তাই আমীরের অনুমতি ছাড়া দাওয়াত গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন। তাই আপনার কাছে এসেছি।

যাহোক, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর গাড়ীতে বসে সৈয়দ সাহেবের খেদমতে হাযির হলাম এবং তাঁর কাছ থেকে জেনে দাওয়াত গ্রহণ করে নিলাম। শায়েখ ওমর চলে যাওয়ার পর সৈয়দ সাহেবের কাছে আরয করলাম, এ সব মান্যবর ব্যক্তিবর্গের সাথে তো সরাসরি সিদ্ধান্ত করে নিলেই ভাল। ইরশাদ করলেন,

মোটেই নয়। সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।

পাকিস্তানের তাবলীগ জামাতের বিশিষ্ট কর্মকর্তা জনাব আল-হাজ্জ আব্দুল ওয়াহাব সাহেব তার এক চিঠিতে লিখেন, সৈয়দ সুলাইমান নদভী সাহেব প্রতি রবিবার আমাদের সাথে যেতেন এবং আমার কথা শুনতেন। তিনি আমার নাম দিয়েছিলেন 'বুলবুলে হাজার দাস্তা'। তিনি বলতেন, তোমরা যখন আমার কাছে আগমন কর আমার মনে হয় দুনিয়াতে শুধু মঙ্গল আর মঙ্গল বিরাজ করছে। আর তোমরা চলে গেলে মনে হয় দুনিয়াতে অনিষ্টই আর অনিষ্ট।

(চ) হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা ও মাযাহেরুল উলূম মাদ্রাসার সাবেক প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব যত দিন সাহারানপুর অবস্থানরত ছিলেন বরাবর মেওয়াতের জলসাগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য দিল্লী আগমন করেন এবং নেজামুদ্দীনই অবস্থান করেন।

এদিকে মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) মেওয়াতের এক পাহাড়ী অঞ্চলে অত্যন্ত কঠিন এক সফরে রওনা হন। মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবকেও সাথে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি যদিও অসুস্থ শরীর নিয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন কিন্তু মাওলানার কথায় তিনি কোন আপত্তি না করে সাথে রওনা হলেন। জুমুআর দিন প্রচণ্ড গরম ছিল। পাহাড় পর্যন্ত বাহন মিলল। সেখান থেকে পাহাড়ে পদব্রজে চড়তে হল। চাচাজান তো এ ধরনের সফরে বেশ অভ্যস্থ ছিলেন কিন্তু মাওলানার জন্য ছিল এ ধরনের সফর এটাই প্রথম।

যাহোক, উভয়ে বেশ কষ্টে জুমুআর নামায ধরার জন্য তাড়াহুড়া করে পাহাড়ে চড়তে লাগলেন। সারা শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছিল। জনৈক অপরিচিত মেওয়াতী এদের এ অবস্থা দেখে অন্য একজনকে ডেকে বলতে লাগল, ওহে দেখছ! মৌলভী 'গাঞ্জী' খাওয়ার লোভে কিভাবে দৌড়াচ্ছে। 'গাঞ্জী' হল মেওয়াতীদের অত্যন্ত প্রিয় এক প্রকার খাবার। যদিও ইউপির লোকেরা তা খেতেই পারে না।

হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের জীবনীতে গ্রন্থকার লিখেন, তাবলীগ জামাতের এ কাজের সাথে মাওলানার গভীর সম্পর্ক ছিল। তাবলীগকে তিনি সাম্প্রতীক কালের জন্য জেহাদে আকবর মনে করতেন।

তাবলীগ জামাতের প্রধান মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-কে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তাঁর ইখলাস ও একনিষ্ঠতাকে তিনি স্বীকার করতেন মনেপ্রাণে। তাঁর ভাষায়, এসব যাকিছু হচ্ছে সব মাওলানার ইখলাস ও একনিষ্ঠতার বরকতেই হচ্ছে।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) তাঁর বিশেষ শাগরিদ ছিলেন। দাওরার অধিকাংশ কিতাব তাঁর কাছেই পড়েছেন। এ ছাড়াও তাবলীগ জামাতের অন্যান্য আকাবিরদের অনেকেই হযরত মাওলানার তরবীয়ত প্রাপ্ত এবং শিষ্য। মাওলানা ইনামুল হাসান ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব তাঁর কাছে পড়েছেন। সৌদিআরবের আমীর মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব তার বিশেষ শাগরিদ এবং তার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন।

মাওলানা মানজুর আহমদ চীনূটী মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে লিখে পাঠালেন যে, মাদ্রাসা থেকে ছুটি নিয়ে তিন চিল্লার জন্য পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) গিয়েছিলাম। সেখান থেকে তাবলীগ জামাতের সাথে মক্কা শরীফ যাচ্ছি। জবাবে মাওলানা লিখেন, আপনি যে কাজ করছেন কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান যুগের জন্য এটা জিহাদে আকবার। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

করাচী থেকে জনৈক ব্যক্তি লিখে পাঠালেন যে, আমি বেশ কিছু দিন যাবৎ বরাবর তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করে আসছি। কিন্তু গত রোববার জনৈক সাথী দেখতে আলিম বলে মনে হচ্ছিল না। তিনি বয়ানে দাঁড়িয়ে বলে বসলেন, গাশতে গেলে সাত লক্ষ নামাযের ছওয়াব পাওয়া যায়। অথচ হেরেম শরীফে কাবা ঘরের নামাযে মাত্র এক লক্ষ ছওয়াব পাওয়া যায়। তার এ কথার কোন অর্থ খুঁজে পাইনি। অথচ মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর ওয়ায (আদাবে তাবলীগে) দেখেছি; তিনি তাবলীগকে ফরযে কেফায়া বলেছেন। তাবলীগ যদি ফরযে আইন না হল তাহলে উক্ত ভদ্র লোক এ ছাওয়াব কোত্থেকে পেলেন।

হযরত মাওলানা জবাবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখলেন, এসব খুঁটি-নাটি বিষয় ছেড়ে দিয়ে যেসব বিষয় শরীয়ত সম্মত মনে হয় সেগুলোর উপর আমল করুন। (তাজাল্লিয়াতে রহমানী)

আর এক ব্যক্তি বরাবর চিল্লায় সময় কাটানোর কথা লিখলে জবাবে তিনি

লিখলেন, বর্তমান যুগে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। তবে আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্যদের যাবতীয় হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(তাজাল্লিয়াতে রহমানী)

(ছ) হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা এবং দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক মুফতী বর্তমান জামেয়া ইসলামিয়া করাচীর নাযিম মাওলানা মুফতী শফী সাহেব সম্পর্কে তো মাযাহেরুল উলূমের নাযিম সাহেব এবং এ অধমের পত্রগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিল্লীর হযরতদের কেউ যখনই করাচী আগমন করতেন, তাঁদেরকে নিজের মাদ্রাসায় নিয়ে যেতেন এবং মাদ্রাসার সকল ছাত্র-শিক্ষককে সমবেত করে তাঁদের দ্বারা তাবলীগের বয়ান করাতেন। তারপর নিজেও তাবলীগের সমর্থনে জোরদার তাকরীর করতেন। এসব তো আমার নিজের দেখা বিষয়। আর সেখানকার ছাত্রদের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বতন্ত্রভাবেও তাবলীগের সমর্থনে এবং তাবলীগের নুসরত এবং তাতে অংশগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তাকরীর করতেন।

এই তো ছিল হযরত থানুভী (রহঃ)-এর শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন খলীফার নমুনা মাত্র। এ ছাড়াও হযরতের অন্যান্য খোলাফাদের অনেকেই এতে অংশগ্রহণ করেছেন, সমর্থন করেছেন, অন্যদের উৎসাহী করেছেন। এরপরও এ কথা কিভাবে বলা যায় যে, হাকীমুল উম্মত এ জামাত সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিলেন। যদি তাই হত তাহলে কি তার খলীফাদের কেউ এ কথা জানলেন না?

আরো মজার কাণ্ড, হযরতের ভাগনে মাওলানা জাফর সাহেব স্বতন্ত্র চিল্লা দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন, যা ব্যস্ততার কারণে বিলম্বিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর চাচাজানের অসুস্থতার সময় সাক্ষাত করতে আসলে তিনি সেই ওয়াদার কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি চাচাজানের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই অবস্থান করেন। এ সময় তিনি তাবলীগের বিভিন্ন এজতেমায়ও অংশগ্রহণ করতেন এবং চাচাজানের মলফুযাতও সংগ্রহ করতেন। তাঁকে এ সান্ত্বনাও দিতেন যে, আপনার পরও ইনশাআল্লাহ এ কাজ এভাবেই অব্যাহত থাকবে; যেমন মলফুযাতে দেহলুভীতে বিস্তারিত রয়েছে।

এখানে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর খোলাফাদের মন্তব্য ও বাণী বিশেষ